WWW.BANGLAPDF.COM

HEAVEN OF BANGLA EBOOKS

FREE EBOOKS DOWNLOAD!!!

To Download Latest Ebooks, MP3 Albums, Video Songs
Please Visit www.Banglapdf.com

Contact Us: Aohor_Galaxy7@Yahoo.com

Deadevil_eee@Yahoo.com

সুমন্ত আসলাম

অলৌকিক

www.Banglapdf.com

www.Banglapdf.com

খুব সাধারণ, খুব পরিচিত কিছু ঘটনা দিয়ে গল্পগুলো লেখা হয়েছে। গল্পের শুরুতে মনে হতে পারে, আরে, এ সব ঘটনা তো আমরা দেখেছি, প্রায়ই রাস্তা–ঘাটে দেখা যায় এটা। কিন্তু গল্পের শেষে আপনার মনে হবে, এরকম কেন শেষটা! কখনো তো ভাবিনি এরকম, কোনো কোনো গল্পে হয়তো কিছু ভাববেনই না। তারপরও গল্পগুলো পড়ে কখনো আপনি হাসবেন, কাঁদবেন, কখনো চুপ করে বসে থাকবেন অনেকক্ষণ।

তারপর?

তারপর নীরব একটা দীর্ঘশ্বাস! হায়, জীবন এরকম!

উৎসর্গ.....

তাঁর কথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি, পরে তার প্রমাণও পেয়েছি—খুব ভালো একজন মানুষ তিনি। ভালো মানুষ হওয়ার একটা বড় অসুবিধা হলো এঁরা সবার সঙ্গে মিশতে পারেন না। তবে তিনি পারেন, তবে তিনি মেশেন তাঁর মতো করেই। কথা কম কাজ বেশীর মতো। প্রচ্ছন্ন একটা ভালো লাগা এসে ছুঁয়ে যায় অস্তিত্বে।

প্রিয় তাহের শিপন, প্রিয় শিপন ভাই

আপনি ভালো একজন পরিচালক, ভালো একজন এডিটর। তবে এটা জানেন কি—আপনি ভালো একজন মানুষও!

ভূমিকা.....

মূলত গল্প দিয়েই আমার শুরু। কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ না, লেখার শুরুটাই হয় আমার গল্প দিয়ে। বই বের করার জগতেও প্রবেশ করি গল্পের বই দিয়ে। www.Banglapdf.com
আমার প্রথম গল্পের বই 'স্বপ্নবেড়ি' আমাকে পরিচিতি দিয়েছে, দ্বিতীয় গল্পের বই 'কেবলই' আমাকে আলোচিত করেছে, আশাকরি তৃতীয় গল্পের বই 'অলৌকিক'ও একটা কিছু করবে।

প্রিয় পাঠক, প্রত্যাশায় রইলাম।

সূ চি প ত্র

অভিনয়	১১
কুৎসিত	২১
বেচারা চেহারা	৩৪
প্রয়োজন	৪৫
মুখোশ	৫৫
চিহ্নস্মৃতি	৬৭
ধূপকাঠি	৭২
অলৌকিক	৮০

অভিনয়

বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে বায়োডাটা চেয়ে পাঠালেন আমার হবু শ্বশুর। মা আমার ঘরে এসে বেশ ঝাঁঝাল স্বরে বলল, 'তোর কোনো বায়োডাটা তৈরি করা আছে?'

WWW.BANGLAPDF.COM

কিছুটা অবাক হয়ে আমি বললাম, 'কেন!'

'পাত্রীপক্ষ চেয়েছে।'

'ওরা কি আমার জন্য কোনো চাকরি ঠিক করেছে?'

'তোর জন্য চাকরি ঠিক করবে কেন, তুই কি বেকার?'

'তাহলে বায়োডাটা দিয়ে কী হবে?'

'জানি না।' মা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'চেয়েছে, দে।'

'চাইলেই দিতে হবে?'

'তোর শ্বশুর চেয়েছেন। অসুস্থ মানুষ, কি-না-কি ভেবে চেয়েছেন।' মা একটু নরম স্বরে বলল, 'আছে না?'

'আছে, কিন্তু দেব না।'

'কেন?' চোখ-নাক একসঙ্গে কুঁচকিয়ে মা কিছুটা শব্দ করে বলল. 'অসুবিধা কী তোর?'

'কোনো অসুবিধা নেই।'

'তাহলে?'

'দিতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

মা একটু এগিয়ে এসে মাথার চুলে হাত বোলাল—আমার একমাত্র দুর্বলতা। ছোটবেলায় পড়তে চাইতাম না, মা তখন মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিত। আস্তে আস্তে কেমন করে যেন টানতে থাকত চুলগুলো। আপনা-আপনি এলিয়ে আসত মাথাটা। একসময় মা হেসে হেসে বলত, 'এখন পড়বি?' সম্মোহিতের মতো মাথা এক দিকে কাত করে বলতাম, পড়ব। অনেক দিন পর মা আবার সে কাজটা করল। এতদিন পরও আমি সেই ছোটবেলার মতো মাথা কাত করলাম এবং বললাম, 'ঠিক আছে, দেব।' মাথার চুলগুলো আরও একটু টেনে মা চলে গেল হাসতে হাসতে।

খুব যত্ন করে লিখে আমি আমার হবু শ্বশুরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বায়োডাটাটা, এক দিন পরই। দুদিন পর তিনি আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন সেটা। খামটা খুলে কাগজটা বের করে চোখ বোলাতেই কিছুটা থমকে গেলাম আমি। নাম, জন্মতারিখ, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা—সব ঠিক আছে, কেবল পেশার জায়গায় মোটা কালির একটা গোল দাগ দেয়া, পাশে একটা চিহ্ন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

ভালো করে আমি আবার বায়োডাটাটার দিকে তাকালাম। না, ঠিকই আছে। অভিনয় বানানটা তো 'ভ' দিয়েই লেখা হয়? না 'ব' দিয়ে? এত দিনের চেনা বানানটা নিয়ে কনফিউশন হয়ে গেল হঠাৎ। পাশ থেকে অভিধানটা নিয়ে বানানটা খুঁজতে লাগলাম। ঠিকই আছে, অভিনয় বানান 'ভ' দিয়েই লেখা হয়। তাহলে? তাহলে কি আমার পেশা 'অভিনয়' দেখে গোল দাগ আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন হবু শ্বশুর মশাই? কেন? আমার পেশা তো অভিনয়ই।

খুব নির্ভেজালভাবে এত দিন পরও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি—আমার পেশাটা অভিনয়ই। প্রতিদিন অভিনয় করেই আমি গড়ে চার শ আশি টাকা পাই, আর এটা দিয়েই আমার সংসার চলে। ইদানীং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় একটু কষ্ট হলেও পাঁচ বছরের একটা মেয়ে, দু বছরের একটা ছেলে এবং প্রতিমাসদৃশ বউকে নিয়ে আমার সংসারটা বেশ ভালোই চলে যাচ্ছে। এই অভিনয়ের টাকা দিয়েই। কিন্তু ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করতে চায় না। তারা কিছুতেই মানতে চায় না আমি অভিনয় করি, অভিনয় করে জীবন বাঁচাই।

অথচ খুব ভালো অভিনয় করি আমি। ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরাও

আমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থাকে আমার দিকে তাকিয়ে, বাস্তবতার সঙ্গে অভিনয়ের কোনো অমিল খুঁজে পায় না তারা কোনো কিছুতেই।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি অভিনয় করি। পেটের মিছেমিছি ব্যথা বলে ছোটবেলায় যারা স্কুলে যেতে চায় না, সে রকম দুষ্টু ছেলের অভিনয় আমি কত করেছি! আমার অভিনয় দেখে সবাই মনে করত সত্যি সত্যি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা আমার এবং ব্যথাটা এতই তীব্র যে, স্কুলে গেলেই সেটা আরও বেড়ে যাবে, এবং বেড়ে যেতে যেতে একসময় মরেও যেতে পারি আমি। কত দিন এভাবে স্কুল ফাঁকি দিয়েছি!

ক্লাস এইটে পড়ার সময় হেডস্যার একদিন তাঁর রুমে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোমার নাম তো মুহিন তালুকদার, না?'

গলার ভেতর কেমন যেন করে উঠল আমার। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করে বললাম, 'জি স্যার।'

হেডস্যার গলার স্বরটা কেমন করে যেন আমাকে বললেন, 'তা কাল স্কুলে আসোনি কেন তালুকদার?'

চেহারাটা তৎক্ষণাৎ শুকনো করে ফেললাম আমি, নিমিষেই চোখ দুটো করে ফেললাম মৃগী রোগীর মতো, শরীরটা কুঁজো, হাঁটু দুটো বেঁকে ভেঙে যায় যায় অবস্থার মতো। তারপর গলাটা কাঁপা কাঁপা করে বললাম, 'জ্বর এসেছিল স্যার।'

'জ্বর?' জ্বর নয়, হেডস্যার আমার চেহারা মাপার চেষ্টা করেন।

'জি।'

'কত জ্বর এসেছিল?'

মাথা চুলকানো শুরু হয়ে যায় আমার। কত জ্বর এসেছিল—হেডস্যারের এ কথাটা বুঝতে পারি না আমি। কত জ্বর মানে কী? জ্বরের কি ওজন আছে? থাকলে সেটা কী দিয়ে মাপে—চাল-ডাল মাপার বাটখারা দিয়ে? না তেল মাপার পাত্র দিয়ে? জ্বর কি কাপড়ের মতো, যা গজ-ফিতা দিয়ে মাপা হয়? আমাদের বাড়িতে তো কখনো জ্বর মাপা হয় না। কারো জ্বর এলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হরিপদ ডাক্তারের কাছে। হরিপদ কাকা কপালে একবার হাত রেখে, লম্বা জিভ দেখে, চোখ দুটো হাত দিয়ে একটু টেনে, কাচের বোতলে পানির মতো ওষুধ দেন। রঙিন তেতো সেই

ওষুধ খেয়ে সবাই ভালো হয়ে যায়। কী বলব এখন হেডস্যারকে? কানের পাশ দিয়ে মাথার ওপর থেকে ঘাম পড়তে থাকে আমার।

হেডস্যার আবার জিজ্ঞেস করেন, 'বলো, কত জ্বর এসেছিল?'

আবার মাথা চুলকাতে থাকে আমার। মাথায় হাত দিয়ে অবোধ গরুর মতো তাকিয়ে থাকি আমি হেডস্যারের দিকে। স্যার মুচকি হেসে বলেন, 'কত জ্বর এসেছিল—তিন শ, চার শ?'

মাথাটা আপনা-আপনি ওপর-নিচ হয় আমার। সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার আবার বলেন, 'তিন শ, চার শ!'

কী বলব, আমি বুঝতে পারি না। হঠাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, 'না স্যার, আরো একটু কম হবে।'

'কত কম?' হেডস্যার গভীর মনোযোগে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'এই...এই পঞ্চাশ-ষাট কম হবে।'

'তাই?'

মাথাটা আবার ওপর-নিচ হয় আমার, মুখটাও হাসি হাসি হয়ে ওঠে প্রশ্নের উত্তর জানা ছাত্রের মতো। কিন্তু হেডস্যারের মুখটা দেখায় গম্ভীর। তিনি আস্তে আস্তে তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসেন আমার দিকে। একেবারে কাছে এসেই যেই না কানটা ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলি কোনো একটা ভুল হয়ে গেছে, এবং সেটা বুঝতে পেরেই অজ্ঞান হওয়ার মতো পড়ে যাই আমি, চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকি মেঝেতে। হা হা করে ওঠেন হেডস্যার। কপালে হাত রাখেন, গলার নিচে হাত রাখেন, হাত টিপতে থাকেন, চোখ খুলে ধরার চেষ্টা করে ঠোঁট ফাঁক করে জিভও দেখেন, আমি চুপচাপ চোখ বুজে পড়েই থাকি।

একটা সময় এসে প্রচণ্ড হাসি পেয়ে যায় আমার, যখন হেডস্যার আমার পেট টিপতে থাকেন। পেটে হাত দিলেই, এমনকি পেট সামান্য স্পর্শ করলেই সাধারণত সুড়সুড়িতে খিলখিল করে হেসে ফেলি আমি। অথচ হেডস্যার পেট টিপছেন, সেই পেট ফেটে হাসি আসছে, কিন্তু আমি হাসতে পারছি না। ভয়াবহ অজ্ঞান হওয়া মানুষের মতো আমি পড়ে থাকি মেঝেতে। আমার সেই অজ্ঞান হওয়ার অভিনয়ে আমি নিজেই নিজের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলাম অনেক দিন।

ক্লাস টেনে পড়ার সময় একবার একটা সিনেমা দেখার ইচ্ছে হয়েছিল খুব, ছোটদের সিনেমা। কী যেন নাম, মনে নেই এখন। বন্ধুরা সবাই দেখেছে, দেখে এসে রঙিয়ে-চঙিয়ে গল্প করছে। তখন সিনেমার টিকিটের দাম ছিল সম্ভবত আড়াই টাকা। কিন্তু এই আড়াই টাকাই পাব কোথায়। অগত্যা বাবার দ্বারস্থ হতে হলো।

বাবা অফিস থেকে এসেই প্যান্ট আর জামা দেয়ালের সঙ্গে একটা কাঠের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতেন। একদিন সুযোগ বুঝে বাবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম আমি। তারপর হাত বের করার সময় কাগজের যে নোটটা বের হয়ে এলো, সেদিকে না তাকিয়ে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম সেটা। দ্রুত বাসার বাইরে এসে পকেট থেকে নোটটা বের করেই চমকে উঠলাম—পঞ্চাশ টাকার নোট! বুকের ভেতর ড্রাম পেটাতে শুরু করল আমার। এত টাকা দিয়ে কী করব আমি? কোথায় লুকাব এটা? নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব! তারপর কী যে হবে, আল্লাহই জানে।

যত দ্রুত সম্ভব বাসার ভেতর চলে এলাম আবার। উদ্দেশ্য এখন একটাই—টাকাটা যথাস্থানে ফেরত রাখা। কিন্তু বাবার ঘরে ঢুকেই দেখি বাবা বসে আছেন একটা চেয়ারে, মাথার কাছে দেয়ালে ঝুলছে সেই শার্ট আর প্যান্টটা।

বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল আমার। মনে হচ্ছে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আমার দিকে না, আমার পকেটের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পর পর আবার মনে হচ্ছে, কেউ এসে সরাসরি হাত ঢুকিয়ে দেবে আমার পকেটে এবং হাত ঢুকিয়ে টাকাটা বের করেই চিৎকার করে বলে উঠবে, 'এই যে, টাকা পাওয়া গেছে! মুহিন টাকা চুরি করেছে। মুহিন টাকা চুরি করে ওর পকেটে রেখেছে।'

ধুকধুকিটা বেশি শুরু হয়ে গেছে বুকের ভেতর। বুকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও কাঁপতে শুরু করেছে একটু একটু। বাবা এতক্ষণ পেপার পড়ছিলেন, আমাকে তেমন খেয়াল করেননি। আমার অস্বাভাবিকতা দেখে তিনি একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কী ব্যাপার মুহিন, কী হয়েছে তোর?'

'বাবা—।' বলেই আমি থেমে যাই।

চেয়ার থেকে উঠে আসেন বাবা। তারপর আমার কাঁধে একটা হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'তোর চেহারাটা এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?

কী হয়েছে তোর?'

'বাবা— ।' পকেট থেকে টাকাটা বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলি, 'এই টাকাটা না আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।'

টাকাটা হাতে নিয়ে বাবা বলেন, 'কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিস এটা?'

'বাসায় ঢোকার সময় দেখি ঘরের কোনায় পড়ে আছে এটা।'

'তাই নাকি!' ভালো করে টাকাটা দেখে বাবা বলেন, 'এটা তো আমার টাকা মনে হচ্ছে, এই যে— ।' বাবা পঞ্চাশ টাকার নোটটা আমার সামনে মেলে ধরে বলেন, 'কোনার দিকে কালির একটা দাগ দেখছিস না। অফিস থেকে ফেরার সময় এই নোটটা বাসের কন্ডাক্টর দিয়েছিল আমাকে।'

'টাকাটা ওখানে গেল কীভাবে?' আমি ঘরের কোনার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বলি।

'সম্ভবত পকেট থেকে রুমাল বের করার সময় পড়ে গিয়েছিল ওটা। যাক, টাকাটা তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস, অন্য কেউ পেলে তো আর ফেরত দিত না।' বাবা টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? টাকাটা কুড়িয়ে পেয়েছিস, সেটা আবার ফেরত দিচ্ছিস, এটা তো ভালো কথা। ভালো কথা কি, খুবই ভালো কথা।'

'বাবা— ।' টাকা চুরির শঙ্কা, ভয়, উদ্বিগ্নতা আরো বেশি জাগিয়ে তুলে সেটা অন্য বিষয়ে স্থানান্তর করে বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এত টাকা তো কখনো হাতেই নিইনি. তার ওপর সেটা আবার রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, তাই কেমন যেন লাগছে।'

কথাটা শুনে বাবা মুচকি হাসলেন এবং মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে কয়েকটা উপদেশও বিলালেন। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। আমি তখন ভাবছিলাম আমার অভিনয়ের কথা—কী চমৎকার অভিনয়ই না করলাম!

কলেজে উঠে বেশ কয়েকটা বন্ধু জুটে গেল আমার, বেশ ভালো বন্ধু। একদিন কলেজে এসে শুনলাম আসিফ নামের এক বন্ধুর মা মারা গেছেন। মা মারা গেছেন, তাহলে তো ওদের বাসায় একটু যেতে হয়।

কয়েকজন মিলে গেলামও। কিন্তু গিয়েই দেখি সবাই কাঁদছে। কয়েকজন তো এমন কাঁদা কাঁদছে, মনে হচ্ছে আসিফের মা মারা যাননি, মা মারা গেছে তাদের। একটু পর খেয়াল করি, কলেজ থেকে আমরা যারা

এসেছি তাদের সবাই কাঁদছে, শুধু আমি ছাড়া। বিব্রতকর একটা অবস্থা। সবাই কাঁদছে, আর আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি।

না, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না, একটা কিছু করা দরকার। চোখ-মুখ কুঁচকিয়ে কান্নার চেষ্টা করলাম, কান্না আসছে না। চোখ-মুখের চামড়া আরো সংকুচিত করে চেষ্টা করলাম, তাও না। গলা দিয়ে একটু একটু আ আ করার চেষ্টা করলাম, সেটা ঠিক আ আ হলো না, কেমন যেন ছাগল ডাকার মতো শোনা গেল। মহা মুশকিল! হঠাৎ কী মনে হলো, কোনো কিছু না ভেবেই, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই মেঝেতেই কিছুটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্না করার মতো চিৎকার করতে লাগলাম। মাথা নিচু করে আছি, কিন্তু আমি আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলাম সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। একটু পর দু-একজন এসে আমাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু আমাকে তুলতে পারল না তারা। আমি মেঝে আঁকড়ে পড়ে রইলাম, কারণ উপুড় হয়ে আ আ করছি বটে, কিন্তু চোখে পানি তো নেই একটুও। চৈত্রের মাঠের মতো খট খট করছে চোখ, চোখের কোনা।

অবশেষে জোর করেই আমাকে তোলা হলো মেঝে থেকে। কিন্তু তার আগেই দু হাত দিয়ে দু চোখ ঢেকে ফেললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে চিৎকার করে উঠলাম, একেবারে হৃদয়বিদারক কান্না। হঠাৎ আমার মনে হলো, চিৎকারটা আরো একটু জোরে হলে নির্ঘাত আসিফের মা চমকে উঠতেন এবং মৃত অবস্থা থেকে জেগে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'এত মানুষ কেন এখানে?'

আসিফদের ওখান থেকে বাসায় ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। নিজেকে এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের কাতারে দাঁড় করাতে অন্য কারো আপত্তি থাকতে পারে, আমার নেই!

নিতু দেখতে নিতুর মতোই ছিল, সবার থেকে আলাদা। অন্তত আমার চোখে। যদিও প্রতিটা প্রেমিকের চোখেই প্রতিটি প্রেমিকা আলাদা। তবুও আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই, নিতু সত্যি আলাদা ছিল। মেয়েরা কষ্ট পেলে কেঁদে বুক ভাসায়, আর ওকে কষ্ট দিলে ও আমার গাল ছুঁয়ে বলত, 'প্লিজ, তুমি কষ্ট পেয়ো না।' ওর এই কথাটা শুনে প্রতিবার নিজেকে শুধরে নিয়ে নিজেকেই বলতাম—না, ওকে আর কষ্ট দেওয়া নয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দুদিন পরই কথাটা ভুলে যেতাম এবং ওকে কষ্ট দিতাম। এ রকম কষ্ট

দিতে দিতে একদিন ওকে শেষবারের মতো কষ্ট দিয়ে ফেললাম। সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার।

ক্রমেই আমি বুঝতে পারছিলাম নিতুকে আমার বিয়ে করা হবে না। অন্য কিছু নয়, স্রেফ আমার অক্ষমতা। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যতই আমাদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসছিল, ততই আমি সংকুচিত হয়ে পড়ছিলাম। সংসার, সংসার খরচ কোনো কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বিশাল ফারাক। আমার হাসিমাখা মুখটা হাসিশূন্য হয়ে যায় দিনের পর দিন। হঠাৎ পালালাম একদিন। কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। নিতুর সঙ্গে তো নয়ই। চার মাস পর নিতুর সামনে অবনমিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ক্ষমা করো আমাকে।'

নিতু খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'করলাম।'

আমি চলে আসছিলাম। নিতুই পেছন ফেরাল আমাকে। কিছুটা বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'বউ ভালো আছে?'

অবাকের চরম পর্যায়ে চলে গেলাম আমি। বিয়ের কোনো প্রসঙ্গই আসেনি আমাদের মাঝে, এমনকি এ বিষয়ে কোনো আভাসও দিইনি আমি, কেবল আমার নতজানু ভঙ্গিই নিতুকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বিয়ে করে ফেলেছি আমি। অথচ বিয়ে করা দূরে থাক, কোনো মেয়ের মুখের দিকেই প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকানো হয়নি এ কদিন। আমার নতজানু ভঙ্গির অভিনয়েই নিতু দূরে সরে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আর কোনো দিন কাছে আসেনি, কথা বলা তো দূরের কথা।

কদিন পর ঈদ, সেবার বোনাস দেয়নি। কিন্তু শপিং করতে হবে। বউ কিছু বলে না, কেবল আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, ছেলে আর মেয়ের জন্য কিনলেই হবে। অথচ নিত্যদিন সংসার চালাতে গিয়ে ওই দুজনের জন্য কিছু কেনারও অবশিষ্ট নেই আমার। অগত্যা একদিন অসুস্থ হয়ে গেলাম আমি। তবে যেই সেই অসুস্থ না, মহা অসুস্থ। পুরো চার দিন বিছানায় শুয়ে ছিলাম আমি। এর মধ্যে ঈদের দিনটাও ছিল। কী নিপুণভাবে অসুস্থতার অভিনয় করে গেলাম আমি। বাচ্চারা টের পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের মা-ও টের পায়নি। বাস্তব অভিনয়ের পারঙ্গমতায় আনন্দ পেলেও চিনচিনে একটা ব্যথাও পেয়েছিলাম বুকে। নিজের অক্ষমতার ব্যথা, প্রিয়জনদের মুখ হাসি হাসি করতে না পারার ব্যথা।

কোনো কোনো দিন এমনও হয়, অফিসে যাওয়ার সময় বউ কিছু জিনিসের কথা বলে। অফিস থেকে বাসায় আসার সময় যেন জিনিসগুলো নিয়ে আসি। সারাক্ষণ মাথায় কুট কুট করে সে জিনিসগুলো। কিন্তু বাসায় আসি খালি-হাতে। খালি-হাত দেখে বউ সে জিনিসগুলোর প্রসঙ্গ তুলতেই একেবারে আকাশ থেকে পড়ি আমি, যেন জিনিসগুলোর নাম আমি এই প্রথম শুনলাম, কিংবা কীভাবে এত করে বলার পরও মানুষ জিনিস আনতে ভুলে যায়! আমি আমার অভিনয়ে মুগ্ধ থেকে মুগ্ধতর হয়ে যাই, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।

যত্রতত্র অভিনয় করতে করতে আমি এখন জীবন-নির্বাহই করি অভিনয় করে। আমি এখন সব ধরনের অভিনয় করি, বলা যায় করতে পারি। আমাদের অফিসে দাঁতবাঁকা এক খর্বাকৃতির মহিলা আছে। বসের সঙ্গে তার খুব ভাব। বস্ মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন। দু-একটা পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। একদিন একটা পত্রিকায় কবিতা ছাপা হতেই সেই মহিলা বস্‌কে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'বস্, কী সুন্দর যে একটা কবিতা লিখেছেন আপনি। আমি জীবনে এত সুন্দর কবিতা পড়িনি।' মহিলার কাজ মহিলা করেছে, আর আমরা যারা সে মুহূর্তে সেখানে ছিলাম, আমরা আমাদের কাজ করেছি। বিশেষ করে আমি। বসের প্রশংসায় আমিও হেসেছি; এবং এমনভাবে হেসেছি, এর চেয়ে একটু কম হাসা হলে বড় ধরনের গুনাহ হয়ে যেত। অথচ যে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সে পত্রিকায় বসের কবিতাটা আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম, সঙ্গে একটা গিফ্‌ট। বস্ এত ভালো কবিতা লেখেন যে গিফ্‌ট দেওয়া ছাড়া সেটা ছাপা হয় না! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই মহিলার প্রশংসা শোনার পর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে দেখে বস্ একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'মুহিন, তোমার কাছে কেমন লেগেছে কবিতাটা?'

কবিতাটা পৌঁছে দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু পড়া হয়নি। ছাপার আগেও না, পরেও না। তবু আমি বিগলিত হাসি দিয়ে বললাম, 'অসাধারণ স্যার!'

বস্ আমার চেয়েও বিগলিত হয়ে বললেন, 'অথচ জানো, দুদিন আগে বাথরুমে গিয়েছি, হঠাৎ কবিতাটা মাথায় এলো। তারপর বাথরুম থেকে বের হয়ে টেবিলে বসেই আধাঘণ্টার মধ্যে কবিতাটা লিখে ফেললাম।'

'তাই নাকি!' এমনভাবে কথাটা বললাম, যেন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে অতিসত্বর ঘটনাটা জানানো দরকার।

বস্ খুশি হলেন। খুশি হলাম আমিও। তবে বস্ খুশি হওয়ার জন্য নয়, নিজের অভিনয় গুণের জন্য।

অফিসের দ্বিতীয় বস্ একটু তাড়াতাড়িই একদিন অফিসে এসে বললেন, 'জানো, কাল রাতে বড় বস্ আমাকে ফোন দিয়েছিলেন বাসায়। কেন দিয়েছিলেন, জানো? বড় ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু কোনো আইডিয়া খুঁজে পাচ্ছিলেন না, শেষে ফোন দেন আমাকে।'

'কিসের সিদ্ধান্ত বস্?'

'সেটা তো তোমাকে বলা যাবে না। তবে জানো, বড় বস্‌কে খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছি আমি। খুব খুশি হয়েছেন তিনি।'

'তা তো হবেনই। আপনি ভালো পরামর্শ না দিলে কে দেবে?'

দু কান পর্যন্ত হাসি বিস্তৃত করে দ্বিতীয় বস্ রুমে চলে গেলেন তার। হাসি বিস্তৃত হলো আমারও, অভিনীত হাসি। কিন্তু আমার এ হাসিটা কারণ অন্য। কয়েক দিন আগে এই বস্‌কেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল অফিসের কী একটা কাজে বাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। আমি আবার হাসলাম, অথর্ব এক মানুষকে আমার অভিনয় দেখিয়ে দিতে পারার জন্য।

এভাবেই প্রতিদিন। বড় বস্, দ্বিতীয় বস্, তৃতীয় বস্, স-ব বস্‌কে অভিনয়ে সন্তুষ্ট করে আমি প্রতিদিন গড়ে চার শ আশি টাকা পাই, এটা দিয়েই আমার সংসার চলে। আমার পাঁচ বছরের একটা মেয়ে, দু বছরের একটা ছেলে এবং প্রতিমাসদৃশ বউকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।

মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফেরার পর আমার মেয়েটি তার তুলতুলে হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করে বলে, 'বাবা, তোমার মুখটা এত শুকনো থাকে কেন?'

আমার একমাত্র ব্যর্থতা, অভিনয়ে ক্লান্ত এই আমি সেই সময়টাতে অভিনয় করতে পারি না। চোখের সমস্ত আবরণ ভেদ করে, চৈত্রের মাঠের মতো ফেটে গিয়ে জল আসতে চায় আমার চোখে। আমি আমার চোখকে লুকাই, নিজেকে লুকাই, একসময় নিজের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলি। আমার সমস্ত অস্তিত্ব ভিজে যায় লোনা লোনা জলে। হায়! যদি একবার মরে যেতে পারতাম!

কুৎসিত

লোকটাকে আমি প্রতিদিন পেটাই, সুযোগ পেলেই পেটাই। পেটাতে পেটাতে অনেক সময়ই রক্তাক্ত করে ফেলি তাকে। এর জন্য আমার ভেতর কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না, কোনো রকম আফসোসও হয় না, বরং এক ধরনের আনন্দ এসে আমাকে উচ্ছল করে তোলে। সেই উচ্ছলতায় আমি আমার সব দুঃখ ভুলে যাই, এমনকি নয় বছর ধরে বুকের ভেতর যে একটা চিনচিনে ব্যথা টের পাই, সেটাও ভুলে যাই। নিজেকে তখন স্রেফ একজন সুখী মানুষ মনে হয়। আট ঘণ্টা নিদ্রিদ্র ঘুমের পর ফোলা ফোলা চোখের সুখী মানুষ।

কোনো কোনো দিন তাকে মেরেও ফেলতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পা দিয়ে গলা চেপে ধরে শ্বাস রোধ করে ফেলি তার; কখনো মনে হয় দু চোখের ভেতর দুটো ছুরি ঢুকিয়ে মগজ ফুটো করে দিই; আবার কখনো ইচ্ছে হয় তার পেটের ভেতরের ভুঁড়িটা বের করে ফুটবল খেলি পুরো দুই ঘণ্টা। কিন্তু তা আর করা হয় না। এতটুকু নিষ্ঠুর হতে মন সায় দেয় না আমার। তাকে বাঁচিয়ে রাখি অপরিসীম এক মমতায়। মানুষ তো!

তাকে আমি প্রথম পেটাই, যেদিন আমার বাসার বাইরের দরজার তালা নষ্ট হয়ে যায়, সেদিন। ইদানীং প্রায়ই অনেকের বাসার দরজার তালা ভেঙে চুরি হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। তাই তালাটা ভেঙে যাওয়ায় বেশ শঙ্কিত বোধ করি। রাতে বাসায় ফিরে বাশার ভাইকে বলি, 'ভাইজান, একটা তালা নষ্ট

হয়ে গেছে।'

গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে পাউরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছিলেন বাশার ভাই। দাঁতের সঙ্গে পাউরুটি লেগে আছে অনেকগুলো। ডান হাতের একটা আঙুল মুখে ঢুকিয়ে চিবানো পাউরুটিগুলো বের করে সেগুলো আবার মুখে ঢুকিয়ে চিবোতে লাগলেন তিনি। তারপর আমার দিকে অবজ্ঞার একটা চাহনি দিয়ে বললেন, 'কোন তালা?'

'বাইরের দরজার।'

'ওখানে তো দুইটা তালা।'

'জি। ওই দুটোর একটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কোনটা?'

'বড়টা।'

ঝট করে সোজা হয়ে বসেন বাশার ভাই, 'বলেন কি! ওইটা তো নষ্ট হওয়ার কথা না। বাজারের ভালো তালা ছিল ওইটা। বলা যায় সবচেয়ে ভালো তালা ছিল। নষ্ট হইল ক্যামনে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এটা বললে তো চলবে না। বাসায় থাকেন আপনি, তালা খোলা বা লাগানো সবই করেন আপনি, সুতরাং ব্যাপারটাতো আপনিই জানবেন।' বাশার ভাই চেহারাটা ম্লান করে বলেন, 'সারা দিন কাজকর্ম করে রাতে বাসায় ফিরে একটু আরাম করে খাচ্ছিলাম, কিন্তু সে খাওয়াটাও হারাম করে দিলেন আপনি।'

বাশার ভাইয়ের সামনের ছোট টেবিলটার দিকে তাকালাম আমি। সেখানে একটা সস্তা কাচের গ্লাসে পানি আর ছোট ছোট দোকানে কিংবা ফুটপাতে বিক্রি করা পাউরুটি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। বাশার ভাই গ্লাসের পানিতে আবার পাউরুটি ভিজিয়ে মুখে দিতে দিতে বললেন, 'যান, আপাতত যে ছোট তালাটা ঠিক আছে সেটা দিয়েই চালান। পরে দেখা যাবে।'

'সেটা কী করে সম্ভব!' আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, 'দু তালাতেই চুরি ঠেকানো যায় না, আর ওই ছোট তালা দিয়ে কী হবে।'

'স্যরি, আপাতত আমি কিছু করতে পারছি না। পরে দেখা যাবে।'

কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বাশার ভাইয়ের

সামনে। তারপর তার মুখ বরাবর মারলাম একটা ঘুষি। ছোট টেবিলের ওপরের গ্লাস তো পড়ে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন তিনিও। বাশার ভাইয়ের ঠোঁটের কোনা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সেই রক্ত মেঝেতে পড়া গ্লাসের পানির সঙ্গে মিশে আস্তে আস্তে লালচে হয়ে যাচ্ছে সাদা রঙের টাইলসগুলো। নিজের রুমে ফেরার সময় আরেকটা ঘুষি মারলাম তার কপালের বাঁ পাশে। অল্পক্ষণের মধ্যে জায়গাটা ফুলে উঠল। মনটা সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ভরে উঠল আমার, নিরঙ্কুশ আনন্দ।

তার পর থেকে বাশার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি একটু এড়িয়ে চলি। কখনো যদি সিঁড়িতে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, আমি টুক করে আমার বাসার ভেতর ঢুকে যাই এবং তিনি তার বাসায় ঢুকেছেন এটা নিশ্চিত হয়ে বাসা থেকে বের হই আবার।

মাসখানেক পর তিনি একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই মুখটা গম্ভীর করে বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনার সঙ্গে ইদানীং আমার দেখাই হয় না!'

WWW.BANGLAPDF.COM

জবাব না দেওয়ার ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'এই তো হলো।'

'আমি আপনার বাসায় এলাম বলেই তো হলো। আগে সিঁড়িতে যাও বা মাঝে মাঝে দেখা হতো আমাদের, এখন তাও হয় না। ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন?'

'ব্যাপার তেমন কিছু না। সময়-সুযোগ হয়ে ওঠে না, তাই...।'

বাশার ভাই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'না ভাই, সময়-সুযোগ কোনো কথা না। আমার কেন যেন মনে হয় অন্য কোনো কারণ আছে।'

আর কিছু বলি না আমি। এমনকি চা-ও খেতে বলি না বাশার ভাইকে। যদিও তিনি আমার বাসায় যতবার এসেছেন ততবার শুধু চা না, আরো অনেক কিছু খাইয়েছি আমি। এবং প্রতিবার খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করেছি, লোভাতুর এমন চাহনি দিয়ে তিন দিন না খাওয়া কোনো ভিক্ষুকও এত মনোযোগ আর তৃপ্তি নিয়ে কখনো কোনো কিছু খায়নি, খাবেও না, খাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

রাতে একদিন খেয়াল করি কোথায় যেন টুক টুক শব্দ হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন একটানা শব্দ। ভালো করে খেয়াল করে দেখি, শব্দটা একটা ছন্দের তালে তালে হচ্ছে এবং একটা সময়ের পর পর হচ্ছে। সেটা এক, দেড় কিংবা দুই

সেকেন্ড পর পর হতে পারে। শব্দটা যে খুব জোরে হচ্ছে, তা না। আস্তে আস্তেই হচ্ছে. তবুও ঘুমটা ভেঙে যায় আমার। প্রথমে বুঝতে পারি না শব্দটা কোথা থেকে আসছে। বাইরের দিকে কান পাতলাম এবং একটু পরই বুঝতে পারলাম, না, শব্দটা বাইরে থেকে আসছে না। কানের মনোযোগটা এবার ঘরের ভেতর আনলাম। হ্যাঁ, শব্দটা ঘরের ভেতর থেকেই আসছে, তবে কোথা থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারছি না।

বিছানায় উঠে বসলাম আমি। আড়মোড়া ভেঙে লাইট জ্বেলে বাথরুমে ঢুকে খেয়াল করি, না, বাথরুমের কোনো ট্যাপ থেকে পানি পড়ছে না। গেস্টরুমের বাথরুমে গিয়ে দেখি, সেখানকার কোনো ট্যাপও জল ত্যাগ করছে না। তাহলে কোথা থেকে? হঠাৎ খেয়াল হলো, কিচেনের অবস্থা কী? কিছুটা দ্রুতগতিতে কিচেনে গিয়ে আলো না জ্বেলেই টের পাই, শব্দটা এখান থেকেই হচ্ছে। লাইট জ্বাললাম। মুক্ত হস্তে দান করার মতো মুক্ত হৃদয়ে জল ত্যাগ করছে সিঙ্কের নিচের ট্যাপটা। খুব বেশী যে শব্দ হচ্ছে এতে, ঠিক তা না, সামান্য হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর ঘুমানো নিঃশব্দতায় সেই সামান্যটাই অনেক বেশি মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। সমস্যাটা আরো প্রকট হচ্ছে আমার বাসায় কোনো খাট কিংবা চৌকি না থাকায়। মেঝেতে ঘুমাই আমি। শব্দ অপরিবাহী হলেও সমস্ত মেঝের কোথাও একটু শব্দ হলে সেটা মেঝের যেকোনো জায়গা থেকেই টের পাওয়া যায়। এমনকি একটু জোরে চললে ইঁদুরের হাঁটাও টের পাওয়া যায়। এ অবস্থাতেই ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম তেমন হলো না। চোখ একটু বুজে আসতেই কানের ভেতর একটানা বাজতে থাকে—টপ, টপ, টপ, টপ।

সকালে বাশার ভাইয়ের বাসায় গিয়ে দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে দেন স্বয়ং বাশার ভাই। কিন্তু তাকে দেখেই চমকে উঠি আমি। খালি-গা, তাঁতের একটা গামছা পরে আছেন তিনি। সেই গামছাটা আবার পুরোনো হয়ে এত পাতলা হয়ে গেছে যে, বাশার ভাইয়ের চোখ-বরাবর না থাকিয়ে গামছার দিকে তাকানো তো দূরের কথা, তার একটুও নিচে দ্বিতীয়বারের মতো তাকানোর সাহস পাচ্ছি না আমি। অসাবধানতাবশত প্রথমবার হয়তো তাকিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার তাকালে সর্বনাশ হয়ে যাবে, বাশার ভাইয়ের না, আমার। মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্রষ্টার এই এত বড় পৃথিবীর এত কিছু থাকতে ঘুম থেকে উঠে কিনা এ রকম একটা অর্ধ উলঙ্গ মানুষকে দেখতে

হলো!

বেশ সকালে এসেছি, তাই কিছুটা কৌতূহলী হয়ে বাশার ভাই বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'একটা কথা বলতে এসেছি আপনার কাছে।'

'এখনই বলতে হবে?'

'না, অসুবিধা থাকলে পরে বলি।'

'অসুবিধা তেমন কিছু না। গোসল করব তো এখন। দেখেন না গামছা পরে আছি।' বাশার ভাই তার পরনের গামছার দিকে তাকিয়ে বলেন, কিন্তু তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকাই না।

'আমি তাহলে এখন যাই।'

'যাওয়ার দরকার কী, বসেন আমি দ্রুত গোসলটা সেরে আসি।'

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলাম আমি। কিছুক্ষণ পর গোসল সেরে প্রায় ভেজা শরীর নিয়েই আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন বাশার ভাই। পরনের সেই গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তিনি আমার সামনের চেয়ারটাতে বসে বললেন, 'কথাটা এবার বলে ফেলুন।'

'কাল সারা রাত একটুও ঘুমাতে পারিনি।'

'কেন?' খুব আগ্রহ নিয়ে বাশার ভাই আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসেন।

'কিচেনের নিচের ট্যাপটা নষ্ট হয়ে গেছে। সারা রাত টপ টপ করে ফোটা ফোটা পানি পড়েছে। পানি পড়ার সেই শব্দে ঘুমাতে পারিনি।' আমি কিছুটা নরম গলায় বলি।

'অসুবিধা কী? সারা দিন কাজ করার পর ট্যাপের মুখটা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখবেন। কোনো অসুবিধা হবে না তখন।' খুব ভালো একটা সমাধান দিয়েছেন এমন তৃপ্তিকর ভঙ্গি নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন বাশার ভাই।

'এটা কী বললেন আপনি?'

'কেন, কোনো খারাপ কথা বলেছি নাকি আমি?'

'ঠিক খারাপ কথা না, তবে একটা সমাধান হলো?'

'সমাধান না হওয়া কী হলো?'

'প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, সেটা রাতে একবার বেঁধে রাখো, সকালে উঠে আবার খোলো, ব্যাপারটা কেমন বিরক্তিকর না।' বাশার ভাইকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি।

'বিরক্তিকর হতে যাবে কেন? প্রয়োজনীয় জিনিস, প্রয়োজন হলে খুলবেন, প্রয়োজন শেষ হলে সেটা আবার বন্ধ করে রাখবেন।'

'অভ্যস্তের একটা ব্যাপার আছে না?'

'আরে ভাই, দু-এক দিন করেন, অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'তাহলে আপনি ট্যাপটা বদলে দেবেন না?'

'বদলে দেব না, সেটা তো বলিনি। কয়েক দিন যাক, সময় করে বদলে দেব একদিন।'

দু মাস পর মাঝরাতে একদিন মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আমার। কয়েক দিন বাশার ভাইয়ের পরামর্শমতো কাপড় দিয়ে ট্যাপটা বেঁধে রেখেছি, এখন বাঁধলেও কাজ হয় না। ট্যাপ দিয়ে পানি আরো বেশি করে পড়ে এখন, তাই শব্দও হয় বেশি। দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে বাশার ভাইয়ের দরজায় নক করতে থাকি আমি। বেশ কয়েকবার নক করার পর বাশার ভাই চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলে দেন। সেদিনের সেই গামছাটাই পরা। আমাকে দেখে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'কী হয়েছে?'

'ঘুমাতে পারছি না বাশার ভাই।'

'কেন?'

'ট্যাপ দিয়ে পানি পড়ছে, সেই পানির শব্দে ঘুমানো যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, কয়েক দিন পর ঠিক করে দেব।'

'সেটা তো আপনি দু মাস আগেও বলেছিলেন।'

'মাত্র তো দু মাস, যান ঘুমানোর চেষ্টা করুন। কয়েক দিনের মধ্যেই ট্যাপটা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ।' কথাটা বলেই দরজাটা বন্ধ করতে নেয় বাশার ভাই। তার আগেই খপ করে গলাটা চেপে ধরি তার। অনেকক্ষণ চেপে ধরার পর মুখ দিয়ে জিভটা যখন বের হয়ে আসতে নেয় লম্বা হয়ে, চোখ দুটোও ফুটে বের হয়ে আসতে চায় কোটর থেকে আর সমস্ত চেহারাটা ক্রমান্বয়ে লাল বর্ণ ধারণ করে জমাট হতে যাওয়া রক্তে, তখন গলাটা ছেড়ে দিই আমি। তারপর বাসায় ফিরে আসি প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে, মন ভালো হওয়া আনন্দ।

দিনে অন্তত দুবার গোসল করতে হয় আমাকে। সকালে একবার, অফিস থেকে ফিরে আরেকবার। এতে মনে হতে পারে আমি বোধহয় পানি বেশি খরচ করি। কিন্তু আমার হিসাব বলে আমরা অনেকের চেয়ে কম খরচ

করি। কারণ এ বাসার প্রতিটি ফ্ল্যাটে কমপক্ষে ছয়জন করে মানুষ থাকে, আর আমাদের ফ্ল্যাটে আমরা থাকি মাত্র সোয়া দুজন। দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ আর একটা কাজের মেয়ে; একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের চার ভাগের এক ভাগ যার উচ্চতা, ওজনও, কেবল তার বুদ্ধিটাই যা—দশ ভাগের এক ভাগ।

মেজাজটা বেশ খারাপ ছিল সেদিন। অফিসটা ভালো কাটেনি। বাসায় এসে গোসল করতেই দেখি পানি নেই। প্রায়ই এমন হয়, প্রয়োজনের সময় পানি থাকে না। আরো খারাপ হয়ে গেল মেজাজটা। ভেজা কাপড় নিয়েই বের হয়ে এলাম বাথরুম থেকে। কারণ আমাকেই কেয়ার করে না, এ বাসার আর কাউকে তো আরো না। পানি ছাড়ার জন্য একবার আমাদের কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলাম। বাশার ভাই এত জোরে ধমক দিয়েছিলেন তাকে, জ্বর এসে গিয়েছিল ওর। সুতরাং পানি ছাড়তে বলার জন্য ভেজা কাপড় নিয়েই আমি বাশার ভাইয়ের বাসায় গেলাম।

বাশার ভাই আমার আপাদমস্তক দেখে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'পাগলা কুত্তায় দাবড়ানি দিয়েছিল নাকি ভাই আপনাকে?'

কপাল কুঁচকে আমি বলি, 'এ কথা বলছেন কেন!'

'না, আপনার কাপড়-চোপড় সব ভেজা দেখছি তো! ভাবলাম, পাগলা কুত্তায় দাবড়ানি দিয়া আপনারে কোনো পগার-টগারে চুবায়া দিছে।'

'না, তেমন কিছু হয় নাই। গোসল করতেছিলাম, কিন্তু দেখি পানি শেষ।'

'বলেন কি! সকালে একবার পানি ছেড়েছিলাম, দুপুরেরও তো আরেকবার ছাড়লাম। এরই মধ্যে পানি শেষ হয়ে গেল! ভাই, আমি তো কারেন্ট বিল দিতে দিতে ফকির হয়ে যাব। ফকির হয়ে যাব কি, অলরেডি হয়ে গেছি। প্রতিদিন তিন-চার বেলা করে পানি ছাড়তে হয়।' বাশার ভাই এমনভাবে কথা বলছেন, যেন তিনি কাঁদছেন।

'কিন্তু আপনি তো ট্যাংকি বোঝাই করে পানি তোলেন না। মোটর কয়েক মিনিট ছেড়েই বন্ধ করে দেন আবার।'

'মোটর কতক্ষণ ছাড়ি না-ছাড়ি সেটা আমার ব্যাপার, আপনি পানি পেলেই হলো।'

'পানি আর কই পাচ্ছি!'

'পানি পান বা না পান, এখন আর মোটর ছাড়তে পারব না। দুবার

অলরেডি ছাড়া হয়েছে, আরেকবার অবশ্য ছাড়ব, তবে সেটা এখন না, রাতে।'

'আমি তাহলে এখন কী করব, সারা শরীর ভেজা, পরনের কাপড় ভেজা।'

'কী আর করবেন, গামছা দিয়ে শরীর ভালোভাবে মুছে অপেক্ষা করুন।'

মাথায় আগুন উঠে গেল হঠাৎ। ঝট করে দু পায়ের মাঝখানে মারলাম একটা লাথি। কোঁত্ করে একটা শব্দ করে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাশার ভাই বসে পড়লেন সেখানেই। চেহারাটা বিকৃত করে ফেলেছেন তিনি, সেই চেহারাটা আরো বিকৃত করার জন্য খামচে ধরলাম তার থলথলে গালটা। ডান হাতের পাঁচ আঙুল বসিয়ে দিলাম ইচ্ছেমতো। প্রথমে চামড়ার সাদা অংশ বের হয়ে এলো, তারপর লাল হতে হতে রক্তের একটা ধারা দেখা দিল সেখানটাতে। আর কিছু না, কেবল আরো একটা লাথি মারলাম ঠিক আগের জায়গাটাতেই। চলে এলাম তারপর।

বাসায় এসেই দেখি, শরীরটা আর ভেজা নেই, শুকিয়ে গেছে। শরীর এত গরম হয়ে গিয়েছিল, টের পেলাম পরনের কাপড়টাও শুকিয়ে গেছে আমার। দ্রুত হাতটা ধোয়ার জন্য বাথরুমে গেলাম। বাশার ভাইয়ের গালের চামড়া দেখা যাচ্ছে হাতের নখের ভেতর। মানুষ সাধারণত এ রকম চামড়া দেখে চমকে ওঠে এবং ঘৃণা বোধ করে, কিন্তু আমার অনেক আনন্দ হলো, ফুরফুরে আনন্দ।

খবরটা প্রায়ই শুনতে পাই, কিন্তু কোনো দিন নিজ চোখে দেখিনি। কয়েক দিন আগে দেখেছি সেটা। আমাদের এক তলার সিরাজ সাহেব গিয়েছিলেন মার্কেটে, শপিং করতে। সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিলেন, দু বছরের মেয়েটিও। ছোট্ট সংসারে কোনো কাজের মেয়ে নেই তাদের। বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে শপিং শেষে বাসায় ফিরে দেখেন তালা খোলা। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন ঠিক খোলা না, ভাঙা। দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে সিরাজ সাহেব দেখতে পান টিভি, ফ্রিজ, খাট, সোফা সব আছে, কেবল তার স্টিলের আলমারিটা খোলা এবং সেই আলমারির একমাত্র ড্রয়ারটাও খোলা। ড্রয়ারটা উদাস ভঙ্গিতে খোলা পড়ে আছে, কিন্তু তার ভেতরের সবকিছু উধাও। সিরাজ ভাইয়ের স্ত্রী চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। আমরা যারা সেই সময়টাতে

বাসায় ছিলাম, তারা ভেবেছিলাম ভাবি গানের চর্চা করছেন। কারণ নতুন একটা হারমোনিয়াম কিনে এনেছেন ভাবি এবং প্রায়ই তিনি কান্না করার মতো গানের চর্চা করেন। একটু পর ভালো করে খয়াল করে দেখি অন্য কিছু। দ্রুত নিচে নেমে দুর্ঘটনার কথাটা জানতে পেরেই বাশার ভাইয়ের কাছে চলে যাই দ্রুত। বাশার ভাই সমস্ত ঘটনা শুনে নির্ভার হয়ে বলেন, 'চুরিচামারি তো বাসাতেই হয়; খাল-বিল-মাঠে তো আর হয় না।'

'কিন্তু চুরিটা হয়েছে কীভাবে, তা তো শুনবেন?'

'কীভাবে হয়েছে?'

'আপনি আপনার বাসার চারপাশ ঘিরে যে গ্রিল দিয়েছেন, চোর সেটা কেটে বাসার ভেতর ঢুকেছে, তারপর সিরাজ সাহেবের ঘরের তালা ভেঙে তাদের ঘরে ঢুকেছে।'

'বলেন কি!' বাশার ভাই আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দ্রুত নেমেই চিৎকার করে বলেন, 'এত বড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল আমার, আর আমি এত পরে জানলাম!'

বাশার ভাই পুরো আধঘণ্টা চিৎকার করলেন সেই কেটে ফেলা গ্রিলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সিরাজ ভাইয়ের যে নগদ নয় হাজার টাকা, ভাবির চার ভরি সোনার গয়না, মেয়ের জন্মদিনে পাওয়া আঠারো শ টাকার প্রাইজবন্ড চুরি হয়ে গেছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই তার। তার চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে এত বড় সর্বনাশ কখনো কারো হয়নি।

তারপর বাশার ভাইকে না হলেও বিশবার বলেছি গ্রিলটা ঠিক করে দিতে, বাশার ভাই সেই কথা শোনা দূরে থাক, কানের আশপাশেও নেননি। তিন-চার দিন আগে শেষবারের মতো তাকে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু কথাটা বলার ইচ্ছা ছিল না, যদি না সেই ভাঙা গ্রিল দিয়ে আবার একটা চোর আসত। ভাগ্যিস পাশের বাসার দারোয়ান সেই চোরটাকে দেখে ফেলেছিল, না হলে সেদিন কারো না কারো সর্বনাশ হয়ে যেত। বাশার ভাই আমার কথাটা শুনে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমি তার সমস্ত বাড়িটা আমার নামে লিখে নিতে বলেছি তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাশার ভাইয়ের মুখ বরাবর একদলা থুতু ছিটিয়ে দিলাম আমি, তারপর তার দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। সাদা ধবধবে থুতুগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখ, গাল, নাক বেয়ে। অবিকল কাচের জানালা বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার

মতো।

সাত বছর ধরে বাশার ভাইয়ের বাসায় ভাড়া থাকি আমরা। কিন্তু আজকের মতো এত অপমান হইনি কখনো, এত বেশি রাগও করিনি কোনো দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক্সারসাইজ করতে যাব বাইরে। কিন্তু মেইন গেটে এসে তালা খুলতে নিতেই থমকে যেতে হলো আমাকে। গেটে লাগানো দুটো তালার একটা তালা খুলেছে, আরেকটা খুলছে না। আমার স্পষ্ট মনে আছে, গতকাল সকাল পর্যন্ত আমি আমার হাতের এ গোছার চাবি দিয়েই তালাগুলো খুলেছি, কিন্তু আজ খুলতে পারছি না। সবগুলো চাবি দিয়েই চেষ্টা করলাম অনেকক্ষণ, তবুও না। এখনো অনেকেই ঘুম থেকে ওঠেনি, বাশার ভাইও না। তবু দ্রুত তিনতলায় উঠে বাশার ভাইয়ের দরজায় নক করলাম। ভীষণ বিরক্ত হয়ে বাশার ভাই দরজা খুলে বললেন, 'কী ব্যাপার, মানুষকে ঘুমও পারতে দেবেন না নাকি আপনারা?'

'স্যরি, বাশার ভাই। আসলে গেটের দুটো তালার একটা তালা খুলছে না, মানে খুলতে পারছি না।'

বাশার ভাই হাই তুলতে তুলতে বলেন, 'একটা তালা চেঞ্জ করা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'জি।'

'কিন্তু আমরা তো জানলাম না ব্যাপারটা।'

'জানানোর দরকার হয়নি তাই জানানো হয়নি।' বাশার ভাই বেশ তাচ্ছিল্য নিয়ে কথাটা বলেন।

'না, হঠাৎ করে তালাটা চেঞ্জ হলো কিনা, তা ছাড়া নতুন তালার চাবিও তো আমরা পাইনি।'

'কমন তালাটা সারা দিন গেটে লাগানো থাকবে, সেটার চাবিও সবার কাছে থাকবে। নতুন তালাটা শুধু রাতে লাগানো থাকবে, কিন্তু এ তালার চাবিটা কাউকে দেওয়া হবে না।'

'কেন!'

'ইদানীং অনেক বাসায়ই চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। আর এসবের সঙ্গে নাকি বাসার ভাড়াটেরা জড়িত থাকে। তারা চুপ করে রাতে গেটের তালা খুলে দেয়, চোর-ডাকাতরা এসে ইচ্ছেমতো সবকিছু নিয়ে যায়।'

'এটা কী বলছেন আপনি!'

'আপনাকে সত্য কথাটা বলছি।'

'কিন্তু আপনার এ চারতলা বিল্ডিংয়ের ওপরতলা খালি হয়েছে কয়েক দিন আগে, এখনো নতুন কোনো ভাড়াটে আসেনি; তিনতলায় থাকেন আপনি; দোতলায় আমরা, সেও সাত বছর হয়ে গেল; নিচতলায় সিরাজ ভাই আছেন না হলেও প্রায় পাঁচ বছর ধরে। আমরা মাত্র দুটো তলায় ভাড়াটে, তাও আছি অনেক দিন ধরে, আপনার এত দিন পর মনে হলো চোর-ডাকাতদের সাহায্য করার জন্য আমাদের কেউ একজন গেটের তালা খুলে দিতে পারে? এটা কি সম্ভব?'

'কোনো কিছুই অসম্ভব না রে ভাই, আর কাউকে বিশ্বাসও করা যায় না আজকাল।' বাশার ভাই আবার হাই তুলতে তুলতে বলেন, 'আজ থেকে আরেকটা নিয়ম করা হয়েছে, সকাল সাতটার আগে গেট খোলা হবে না। যদি জরুরি কোনো প্রয়োজন থাকে, তখন নাহয় দেখা যাবে।'

'এত ঝামেলা করার দরকার কী, একটা দারোয়ান রেখে তার হাতে চাবি দিলেই তো হয়ে যায়, আপনার কষ্ট করতে হয় না।'

'দারোয়ানের বেতন কে দেবে, আপনি?' বাশার ভাই হাত মাথার ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলেন, 'যান ভাই, ঘুমাতে যান, সাতটা বাজতে এখনো অনেক বাকি। আর চোর-ডাকাতের কথা বললাম না, আজকাল অনেক চোর-ডাকাত ভাড়াটে সেজে বাড়ি ভাড়াও নেয়।'

বাশার ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। তার চোখ দুটো বলে দিল কথাটা যেন তিনি আমাকেই উদ্দেশ করে বললেন। অপমানের একটা ধারা বয়ে গেল সারা শরীরে, রাগ এসেও ভর করল সঙ্গে সঙ্গে। কোনো কিছু ভেবে পেলাম না সে মুহূর্তে, বাশার ভাইয়ের দু চোখের ভেতর আমার দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম ঝট করে, তারপর ডান হাতটা দরজার সঙ্গে চেপে ধরে ভেঙে ফেললাম মটাস করে, বাঁ হাতটাও। বাশার ভাই চিৎকার করে ওঠার আগেই তার বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর মারলাম একটা লাথি, পরক্ষণেই ডান পায়ের হাঁটুর ওপরও। গোড়াকাটা গাছের মতো ধীরে ধীরে মেঝেতে পড়ে গেলেন বাশার ভাই। চিৎকার করার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, কাতরাতেও ভুলে গেছেন। অপমান আর রাগের চরম প্রতিশোধ নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম আমি।

মনটা খারাপ হয়ে আছে আমার। এ বাসায় আর থাকা যাবে না। অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি, এমন সময় কাজের মেয়েটা এসে বলল, বাড়িওয়ালা নাকি ডাকে। ড্রয়িংরুমে এসে দেখি বাশার ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলতে চাইছি আপনাকে। আগামী মাস থেকে ভাড়া কিন্তু পাঁচ শ টাকা করে বেশি দিতে হবে।'

কিছুই বললাম না আমি। ভাবলেশহীন তাকিয়ে রইলাম বাশার ভাইয়ের মুখের দিকে। তিনিও আর কিছু বললেন না, চলে গেলেন। সাত বছর ধরে তার বাসায় আছি আমরা। সেই সাত বছর বাসাটা যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে, মাঝখান থেকে বাইরের দরজার তালা নষ্ট হয়ে গেছে, সিঙ্ক নষ্ট হয়ে গেছে, পানির ট্যাপ, বাথরুমের ফ্ল্যাশ, শাওয়ার, বারান্দার লাইট, জানালার কাচ, ঘরের রঙ, আরো অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটা জিনিসের জন্য অনেকবার বাশার ভাইয়ের কাছে যাওয়া হয়েছে, কিছুই হয়নি কোনো কিছুর, কিন্তু ভাড়া বেড়েছে প্রতিবছর। ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার চিরাচরিত দ্বন্দ্বগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে বরং প্রতিদিন। আর আমিও সংকুচিত হয়ে গেছি প্রতিদিন, তারপর মেরুদণ্ডহীন। তার তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে নিরুপায় হয়ে। মোটামুটি মানের কোনো বাসা খুঁজে বের করা, তারপর সমস্ত জিনিস নিয়ে বাসা বদল করা, অতঃপর নতুন বাড়িওয়ালার সঙ্গে আবার দ্বন্দ্ব—না, তার চেয়ে এক জায়গাতেই বাস করা উত্তম। এই ভাবনাতেই এখানে থেকে যাওয়া।

বিরক্ত হতে হতে হঠাৎ একদিন মনে হলো বাশার ভাইকে পিটুনি দিলে কেমন হয়। সত্যি করে তো আর দেওয়া যাবে না, মনে মনে দিলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ, পিটুনি দেওয়া শুরু করি বাশার ভাইকে। তারপর হঠাৎ অনুভব করি, শান্তিতে ভরে যাচ্ছে মনটা, অভূতপূর্ব সুখ এসে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত অস্তিত্বে। সেই যে শুরু, আজও।

ভাড়া বাড়ানোর প্রশান্তিতে মুচকি হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন বাশার ভাই। মাথাটা গরম হয়ে উঠল আমার। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে বাশার ভাইয়ের মেরুদণ্ড বরাবর মারলাম এক লাথি। বাশার ভাই পড়ে গেলেন সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ টপকে। তারপর ঝট করে আমার দিকে তাকালেন তিনি, হতাশ চাহনি। আমি আরো একটু নেমে এসে তার মুখ সই

করে মারলাম আরেকটা লাথি। রক্তের দুটো ধারা বের হয়ে আসছে বাশার ভাইয়ের নাক আর ঠোঁটের কোনা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ বাশার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর তার মতোই মুচকি হাসতে হাসতে বাসায় চলে আসি আমি। আশ্চর্য, বুকের সমস্ত গ্লানি কর্পূরের মতো উড়ে যায় মুহূর্তেই, সবকিছু মনে হয় অপার্থিব আনন্দময়—সুখের চরম আবেশে চোখ দুটো বুজে আসে আমার!

বেচারা চেহারা

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার। পাশ ফিরে দেখি গালু ভাই নেই। ছ্যাৎ করে ওঠে বুকটা। নিঃশব্দে বিছানায় উঠে বসি। অন্ধকারেই ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করি। কিছু দেখা যায় না।

বিছানা থেকে নেমে আসি আমি। পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই বাথরুমের দিকে। খুট করে বাথরুম খুলে দেখি, নেই। ধক্ করে ওঠে বুকের ভেতর। গেল কোথায়? আস্তে আস্তে চলে আসি বারান্দায়। ডান দিকে তাকাই, নেই; বাঁ দিকে তাকাই, নেই। ফাঁকা। শুধু বারান্দার এক কোণে একটা তেলাপোকা কী যেন খাচ্ছে।

ভীষণ ভয় লেগে যায় মনে। পেটের ভেতর চিঁউ করে ওঠে। শিরশির করতে থাকে পিঠের মাঝখানটা। মাত্র চার দিন হলো এখানে এসেছেন গালু ভাই। প্রথমেই বাসায় না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। ফুফু হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখেন তাকে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলেন, 'কিরে, কখন এলি?'

গালু ভাই কথা বলেন না। কালো মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে যান ফুফু, 'কী হয়েছে রে, কোনো দুর্ঘটনা, সব ঠিক আছে তো?'

গালু ভাই এবারও কথা বলেন না। শুধু পেন্ডুলামের মতো মাথাটা এদিক ওদিক নাড়াতে থাকেন। ফুফু ভয় পেয়ে যান। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'এখানে কী, বাসার ভেতর আয়।' গালু ভাই পুতুলের মতো হাঁটতে

হাঁটতে ভেতরে যান।

কাঁধের ব্যাগটা ধপাস করে মেঝেতে ফেলে গালু ভাই একটা চেয়ারে বসে পড়ে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের সাদা দেয়ালের দিকে। ফুফু আরো ভয় পেয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ফুপাকে ফোন করেন। ফুফা বাসায় এসে দেখেন, গালু ভাই দেয়ালের দিকে তাকিয়েই আছেন। বিড়ালের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তার দিকে, যেন ইঁদুর ধরার মতো তাকে ধরে ফেলবেন। কিন্তু ফুফা তা না করে চলে গেলেন টেলিফোনের কাছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, 'এই, এই স্টুপিড, সামান্য একটা মেয়ের জন্যই এমন। ও মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তো কী হয়েছে, পৃথিবীতে মেয়ের অভাব আছে নাকি! তোর বাবা-মার সাথে কথা বললাম, ওরা কাল-পরশু আসছে। গাধা! আজকাল মশার মতো মেয়েরা চারদিকে ভনভন করে। তোর বয়সে, বুঝলি উল্লুক, তোর বয়সে অ্যাট এ টাইম ছয়-সাতটা মেয়ের সঙ্গে ইয়ে করতাম। তার পরই তো তোর ফুফুর পাল্লায় পড়ে—।' ফুফা ফুফুর দিকে তাকান এবং সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করা মেশিনের মতো থেমে যান। ফুফুর চোখ দুটোর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে চোখ দুটো এখন ওয়াক আউট করে কোটর বর্জন করবে। মোসাহেবি হাসিতে ফুফা মুখ ফিরিয়ে এনে গালু ভাইয়ের দিকে তাকান। ট্যাপের পানির মতো দুটি জলধারা গড়িয়ে পড়ছে গালু ভাইয়ের চোখ থেকে।

WWW.BANGLAPDF.COM

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমি। কোথায় যেতে পারে, ভাবছি। দোতলা থেকে একতলায় নামার গেটটাও ভেতর থেকে বন্ধ। সুতরাং—, হঠাৎ খেয়াল হলো, যাওয়ার তাহলে একটাই জায়গা আছে, ছাদে। দোতলার পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়, এতক্ষণ মনেই পড়েনি।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। ছাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প্রথমেই চোখ গেল পুবের কোণে। না, গালু ভাই ওদিকে নেই। উত্তর-দক্ষিণ, সেদিকেও নেই। থমকে গেলাম। পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম পশ্চিমে পানির ট্যাংকের দিকে। যে কথা সেই কাজ। বেশ নায়কোচিত ভঙ্গিতে ট্যাংকের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গালু ভাই। দৃষ্টি তার পাশের বাসার ছাদের দিকে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। একটা নারীমূর্তি সরে গেল দ্রুত। গালু ভাই একটু সরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু এখান থেকে ওদের

ছাদের ট্যাংকের আড়ালে কিছু দেখা গেল না। হতাশাজনিত একটি নিঃশ্বাসে গালু ভাই থমকে দাঁড়ালেন। আমি ডাকলাম, 'গালু ভাই।'

'কে!' বলেই গালু ভাই লাটিমের মতো চোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এখানে কী করছ?'

'ও..., তুই! বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিস ছাগল।'

'একা একা কী করছ এখানে?'

'ভাবছিলাম।'

'কী বিষয়ে?'

'বুকে বড় কষ্ট রে।'

'নষ্ট হওয়ার?'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?' মিনমিন করেন গালু ভাই।

'ওই ছাদে কাকে যেন দেখলাম!'

গালু ভাই কিছু বলে না। আস্তে আস্তে হেঁটে যান দোতলায়। আমি ভাবতে থাকি, কে ও? ওই বাসায় মেয়ে মানুষ তো একটাই। মিনির দাদু। বুড়ো মানুষ। এত রাতে তিনি! ভেবেই পেছন ফিরে তাকাই। আগের মতোই ওই ছাদ থেকে একটা ছায়া সরে গেল দ্রুত।

দুই

মিটিমিটি হাসছেন গালু ভাই। তার চোখ দুটো কুঁচকে মুখটা একবার ডান দিকে, এবার বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখেন। হাসির মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দেন। হাসিটা বিস্তৃত হতে হতে যখন দু কান পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন হাসি আর হাসি থাকে না। ডারউইনের বিবর্তনবাদের আমাদের ওই আদি পুরুষের মুখটা তখন বেশ মনে পড়ে যায়।

প্রতিদিন সকালবেলা গালু ভাইয়ের ওই একটাই কাজ। প্রথমেই আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করাবেন। কিছুটা মেয়ে দেখতে আসা পাত্রপক্ষের সামনে মেয়েকে দাঁড় করানোর মতো। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে নিজেকে তিনি দেখবেন এবং ইচ্ছেমতো সময় নিয়ে শারীরিক বিশ্লেষণ করবেন। তারপর দু হাত দিয়ে প্রেমিকার মুখ ধরার

মতো নিজেই নিজের মুখটা ধরবেন। ভাবখানা এমন, ওটা তার মুখ নয়, প্রেমিকার মুখ। ক্রমান্বয়ে বুড়ো বানরের মতো ভেংচি কেটে তিনি তার দাঁত দেখবেন, জিভ দেখবেন, এমনকি আলা-জিভটাও দেখবেন। অবশেষে নিজের মাঝে একটা তৃপ্তিবোধ এনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলবেন, 'বল তো, আমার চেহারাটা কেমন?'

'বড় সুন্দর।' নালু ভাইয়ের বুড়ো বানরের মতো চেহারাটা দেখে আমি তার চেয়েও উৎফুল্ল হয়ে বলি, 'সত্যি সুন্দর, তুমি সিনেমায় চান্স নিতে পারো।'

'ইট ইজ নট এ ম্যাটার অব ব্যাপার। দেখি কী করা যায়।'

'করা-করির কিছু নেই, করে ফেললেই হলো। তা ছাড়া তোমার এখন একটা সুযোগ আছে। কারণ, ইদানীং টারজানজাতীয় ছবি তৈরি হচ্ছে বেশ।'

'আমাকে কি টারজান মানাবে?' টানটান সিনা ফুলিয়ে গালু ভাই আবার আয়নার দিকে তাকান।

'ঠিক টারজান নয়, টারজানের সঙ্গী।'

'মানে বন্ধুর চরিত্র আর-কি, হা-হা।' টারজানের লেজওয়ালা বন্ধুর মতোই হাসি দেন গালু ভাই।

'হ্যাঁ, বন্ধুই তো।'

'তাহলে চান্সটা নিতেই হয়।'

'নিতে হয় কি, অবশ্যই নেবে। তাতে বাংলাদেশের ফিল্মের প্রযোজকদের যেমন উপকার হবে, তেমনি তোমারও একটা গতি হবে। ওরা নির্বোধ ভাষাহীন অভিনেতার পরিবর্তে নির্বোধ ভাষা জানা অভিনেতা পাবে। তা ছাড়া ট্রেনিংয়ের ঝামেলাও থাকবে না। শুধু...।'

'শুধু?' কুদু কুদু চোখের গালু ভাই জুলু জুলু চোখে তাকায়।

'শুধু পশমের একটা পোশাক ছাড়া।'

'পশমের পোশাক দিয়ে কী হবে?'

'এই ধরো, টারজানের অভিনয় করতে হলে যেমন টারজানের মতো পোশাক দরকার, তেমনি তার বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করতে হলে তার বন্ধুর মতোই পোশাক দরকার। মানে টারজানের যেমন ছুরি দরকার, বানরের তেমনি পোশাক দরকার। যার যা দরকার আর-কি, হা-হা।'

আমার হাসিতে গালু ভাই সামান্য কাশি দিয়ে বলেন, 'ঠিক, একদম

ঠিক।' টিকটিকির মতো জিভা দিয়ে গালু ভাই টিক টিক আওয়াজ করেন, আমি দম দেয়া পুতুলের মতো মাথা ঝাঁকাতে থাকি।

তিন

বিকেলে গালু ভাই প্রায় হন্তদন্ত হয়ে দন্ত বের করে ছাদ থেকে ছুটে এসে আমাকে ঝাঁকাতে থাকে। আমি মনে মনে বকুনি দিয়ে তার ঝাঁকুনি খেয়ে দিবানিদ্রা থেকে উঠে পড়ি। ঘুম ঘুম চোখে দেখি ধুম মেরে সে বসে আছে। আমার ঘুম ভাঙা দেখে চাঙা হয়ে বলেন, 'বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে গেছে রে।'

আমি অবাক হওয়ার ভানে চোখ দুটো টান টান করে বলি, 'কী ব্যাপার?'

'দুপুর থেকেই আমি লক্ষ করছি, একটু পরপর ওই মেয়েটা ছাদে এসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমিও ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।'

'যেমন চিড়িয়াখানায় বানরের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে আর মানুষের দিকে বানর তাকিয়ে থাকে, তেমন আর-কি।'

'তো, কী হয়েছে জানিস?'

'না, জানি না।'

'মেয়েটা বেশ কিছুক্ষণ আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হলো। তারপর আকারে-ইঙ্গিতে ওদের বাসায় যেতে বলল।'

'মানে, মেয়েটা তোমাকে ভালোভাবে দেখে চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল। তারপর তোমার চেহারা দেখে ভাষাহারা হয়ে ইশারা করে বাসায় যেতে বলল?'

'হ।' থ হয়ে গেলেন গালু ভাই।

'যাবে, তা কবে?'

'সকালে এবং সঙ্গে তোকেও যেতে হবে।' বলেই গালু ভাই কী যেন ভাবেন।

'দেখতে চেয়েছে তোমাকে, সেখানে আমি কেন?'

'আমার শরম করে।' পরম শরমে গালু ভাই কথাটা বলেন।

গালু ভাইয়ের শরম চরমে ওঠার আগেই আমি নরম সুরে বলি, 'আমি

যাব।'

চার

সারা রাত গালু ভাইয়ের ঘুম হয়নি, তার মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। তবে খুব যত্ন করে শার্ট-প্যান্ট পরেছেন। একটু পরপরই আয়নায় নিজেকে দেখছেন, আমি তাকে দেখছি। যেন চোর গৃহস্থের বাগান দেখছে, গৃহস্থ চোরকে দেখছে।

আমরা রওনা হলাম। তার আগে গালু ভাই বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগলেন। তারপর শার্টের বোতাম খুলে নিজের বুকে ফু দিলেন, আমাকেও। তার থুতুমিশ্রিত ফুঁতে বুক ভিজে গেল আমার।

ওদের বাসার কাছাকাছি এসে গালু ভাই আমার পাশাপাশি দাঁড়ালেন। আমি তাকে নক্ করতে বললাম দরজায়। দরজায় নক্ করতেই গালু ভাই কারেন্টে শক্ খাওয়ার মতো কেমন যেন ধক্ করে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুলে গেল। সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে গালু ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, এই কন্যাই তার বুকে প্রেমের বন্যা বয়ে দিয়েছে। আমি মেয়েটার দিকে দর্শন দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গরম লোহার যেন ঘর্ষণ পেলাম। কিন্তু তার হাসি হাসি মুখ থেকে চোখ সরিয়ে গালু ভাইয়ের দিকে তাকালাম। তার মুখও হাসি হাসি হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই হাসাহাসি বাসি হওয়ার আগেই আমি সামান্য কাশি দিয়ে গালু ভাইকে ঠাসি মেরে বসতে বললাম।

তিনি বসলেন, আমিও বসলাম। একটু পর মিনির দাদু এলো। আমরা সালাম দিলাম, উনি বসলেন। মুখোমুখি তিনজন। পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। গালু ভাই মাথা নিচু করে ফেলেছে।

'তোমাকে তো আমি চিনি। মিনি থাকতে তুমি আগে কত আসতেন' দাদু তার জাদুমাখা হাসিতে বলেন, 'তা ইদানীং বাসায় আসাই ছেড়ে দিয়েছ।'

'জি। আশা ছেড়ে দিয়েছি বলেই তো আসা ছেড়ে দিয়েছি। মানুষ আসলে আশা করেই আসে। কিন্তু সেই আশা যখন শূন্যে ভাসে, তখন সে ফাঁসে।'

'তুমি আর মিনি যা করতে, সারা দিন জ্বালিয়ে মারতে, আমার এখনো মনে আছে।'

'মারতে মারতেই একদিন মরতে হয়। তার জ্বালা কি কখনো ভোলা যায়? জ্বালাই তো জীবনকে ফালা ফালা করে।'

'আসলে তোমাদের ভালোবাসা ছিল একমুখী।'

'ঊর্ধ্বমুখী। আমি ভালোবাসতাম মিনিকে, মিনি ভালোবাসত Moneyকে। তাই তো আমাদের ভালোবাসার গলাগলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে চলে গেল। নিশ্চিত জীবনের নিশ্চয়তা পেয়ে ইস্তফা দিল ভালবাসা, বিয়ে করল টাকাওয়ালা ওই টাক-ওয়ালা লোককে।'

'কিন্তু তোমার কথা ও এখনো বলে আর কাঁদে।

'কাঁদে! হয়তো স্বাদে। কথায় আছে না, মানুষ দুঃখেও কাঁদে, সুখেও কাঁদে। আর মেয়েরা পুরুষকে ফাঁদে ফেলে স্বাদে কাঁদে।'

'আচ্ছা থাক ওসব কথা। কাল রাতে ফুলি বোধহয় তোমাদের ছাদে এ ছেলেটাকে দেখেছে।'

'এবং হেসেছে।' গালু ভাই দাঁত বের করে বলেন আর হাসেন। সঙ্গে সঙ্গে চিমটি কাটি তার বাঁ পায়ের পাশে। মনে মনে বলি, সেরেছে!

'তা ফুলি এর চেহারার বর্ণনা দিতেই খুব দেখতে ইচ্ছে করল।'

'তাই তো এলাম।' চোখে চিকচিক ভাব এনে গালু ভাই খিকখিক করে হাসতে থাকে।

'তুমি তাকে দেখ নাই।' দাদু আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকান, 'আমাদের বাসায় বেশ কয়েক বছর আগে মতলব নামে একটা কাজের ছেলে ছিল। খুব বজ্জাত ছিল হারামজাদা, মতলববাজও। একদিন আমার গলার একটা সোনার চেইন চুরি করে পালিয়ে গেল, আর এলো না। বাঁদরের মতো চেহারা ছিল ওর। তাই আমরা ওকে ডাকতাম মতলব বান্দর বলে। তা তোমার নাম কি মতলব?' দাদু তার গলার গয়নাটা টানতে টানতে গালু ভাইয়ের দিকে তাকান।

ছ্যাৎ করে গালু ভাই দাঁড়িয়ে পড়েন। তার ধাক্কায় আমি কাত হয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে দাদু হাত বাড়িয়ে বলেন, 'যাচ্ছ কোথায়, চা খাবে না?'

'না।' বলে শাঁ শাঁ করে গালু ভাই বাসার দিকে পা বাড়ান। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার পরই আবার ঘুরে দাঁড়ান। তারপর ঘুরে নরম সুরে বলেন, 'মেয়েটা

কে?'

'আমার বাসায় কাজ করে, মানে কাজের মেয়ে।' দাদুর কথাটা শুনে গালু ভাইয়ের মাথায় যেন বাজ পড়ে। ঝট করে আমি গালু ভাইয়ের দিকে তাকাই। তিনিও আমার দিকে তাকান। চোখে চোখ পড়তেই গালু ভাই আবার ঘুরে দাঁড়ান, গট গট করে সটকে যান। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে শব্দ আসে—বান্দর! গালু ভাইয়ের হাঁটা কিছুটা মন্থর হতেই আমি পিঠে দিই মৃদু চাপড়। গালু ভাই হাঁটতে থাকেন, পেছন পেছন আমিও হাঁটি।

পাঁচ

বাসায় এসে দেখি কাকা-কাকি এসে গেছেন। ডাইনিং টেবিলে বসে তারা খাচ্ছেন তার পাশে বসে ফুফা-ফুফু কী যেন বলছেন। গালু ভাইকে দেখে কাকি প্রায় দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর নাকি সুরে তার হাত ঝাকি দিয়ে বলেন, 'দুষ্ট কোথাকার, এভাবে না বলে আসতে হয়!'

সঙ্গে সঙ্গে কাকা ফোঁস ফোঁস করে বলেন, 'ওই তোমার দোষ। আদরে আদরে মাথায় তোলা। বাঁদরকে বেশি আদর করতে নেই, তাতে মাথায় ওঠে।'

'এবং সেখানে উঠে মূত্র ত্যাগও করে।' আমি কাকার দিকে তাকাই।

'চুপ থাক বদমাশ।' খ্যাসখ্যাস করে কাকি চেয়ারে ঠ্যাস দিয়ে বসেন।

'আসল ব্যাপার কী বলো তো জব্বার?।' ফুফা কাকার দিকে তাকায়।

'ব্যাপার আর কিছু না দুলাভাই। আমাদের এ বান্দর প্রেম করেছে এক সোন্দর মেয়ের সাথে।'

'স্বাভাবিক।' ফিক করে আমি হেসে বলি, 'কারণ এ বয়সটাই তো প্রেমের বয়স। শুনেছি, তুমি আর কাকিও নাকি এ বয়সে—।'

'অরণ্য, তুই ইদানীং জঘন্য হয়েছিস।' বন্য পশুর মতো কাকি চোখ লাল করে ফেলে।

'তা সব কথাবার্তা বলে ওকে নিয়ে গেলাম ওই মেয়ে দেখতে। ঘোমটা পরে একসময় মেয়েটি এলো। আমি বললাম, মা মুখ তোলো তো। বেশ কয়েকবার বলার পর মেয়েটা মুখ তুলে চাইল এবং সরাসরি গালুর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকারে সে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। তারপর

ভয়ে চোখ বুজে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, হনুমান হনুমান।'

'কেন, গালু ভাই সাথে করে হনুমান নিয়ে গিয়েছিল নাকি?'

'তা নেবে কেন, ওর চেহারা দেখেই তো...। ওর চেহারা নাকি হনুমানের মতো।'

'কিংবা হনুমানের চেহারা গালু ভাইয়ের মতো।'

'হয়তো। কিন্তু হিসাব মেলাতে পারি না, আমার ছেলের চেহারা এমন হলো কেন?'

'কারণ নিশ্চয় আছে। তবে কারণ বলতে যদি বারণ করো, তবে বলব না।'

'না, তুই বলে যা।'

আমি কাকির দিকে তাকাই। কাকি দাঁত কড়মড় করে আমাকে চড় দেখায়। 'না থাক। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, প্রেমই যদি হবে, মেয়েটা গালু ভাইকে দেখে চিৎকার করে উঠল কেন।'

'কারণ মেয়েটা তো ওর সঙ্গে প্রেম করেনি, গালুই মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করেছে।'

'মানে গালু ভাই দূর থেকেই হৃদয়ে সুর তুলেছে আর একা একা বুকে ছবি এঁকেছে এবং দেখেছে।'

'সঙ্গে সঙ্গে ভালোও বেসেছে। কিন্তু মেয়েটা তো ওকে কোনো দিন দেখেনি।'

'তাই আগে চিৎকারও করেনি।'

'রাইট। তো ইদানীং মনে হচ্ছে গালুর মাথা ঠিক নেই।'

'কেন, মেয়ে দেখলেই বুঝি বিয়ে করতে চায়?'

'তুই কী করে বুঝলি?' কাকা কিছুটা লাফিয়ে ওঠেন।

কিছু বলি না আমি। শুধু চোখ দুটো বুজে একটা হাসির ভান করি। তারপর গালু ভাইয়ের দিকে তাকাই। তিনি কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

ছয়

বেড়ানো শেষ করে রাতে বাসায় ফিরে দেখি জটাধারী এক লোক বসে আছে

ঘরে। চোখ বুজে মাথা নিচু করে আছে। মনে হয় ধ্যানে মগ্ন। গালু ভাই আমাকে ইশারা করে বলেন, কে। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, 'জানি না।'

ভেতরের ঘরে যেতেই কাকি দৌড়ে এসে বললেন, 'অরণ্য, খুব কামেল একজন মানুষ পেয়েছি। গালুর মাথা থেকে ভূত এবার ছাড়িয়েই ফেলবে।'

রাতে নিচের ঘরে গালু ভাই আর কামেল বাবাকে রেখে ফুফা-ফুফু দোতলায় চলে এলেন। গভীর রাতে নিচতলায় বিশেষ আধুনিক কায়দায় তার চিকিৎসা হবে। কাকা কাকি পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি আমার ঘরে যাওয়ার আগেই কাকি বেশ হেসে হেসে বললেন, 'আশা করি সবকিছু এবার পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

আমি মুচকি হেসে দরজা বন্ধ করলাম।

সাত

খুব সকালে ঘুম ভাঙে আমার। বাসায় আর কারো ঘুম ভাঙেনি। আমি নিচে নেমে আসি। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই গালু ভাইয়ের ঘরের দিকে। দরজার পাল্লাটা একটু ফাঁকা হয়ে আছে, মানে খোলা। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকি। সুইচটা টিপে আলো জ্বেলেই চমকে উঠি। মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন গালু ভাই। পোশাকবিহীন তার দেহটা দেখে মনে হচ্ছে, এইমাত্র তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন, মানে জন্ম নিলেন। ধাক্কা দিয়ে আমি গালু ভাইকে জাগালাম। ধড়মড়িয়ে উঠে প্রথমেই নিজের দিকে তাকালেন। তারপর দু পায়ের সংযোগস্থলে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'অ্যা, এমন করল কে?'

'মনে হয়, সে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। কামেল বাবা প্রথমে আমাকে এক গ্লাস শরবত খেতে দিলেন।'

'তুমি খেলে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর তোমার ঘুম ঘুম ভাব হলো।'

'ঠিক।'

'তখন সে ঘরের সব জিনিস বেঁধে ফেলল।'

'বোধহয়।'

'বোধহয় নয়, চোখ দুটো মেলে দেখো।'

'কিরে, আলমারি তো খোলা। টিভি, ভিসিডি, এমনকি সারা ঘরে কোনো কাপড়-চোপড়, লেপ, তোশক কিছুই নেই!'

'তোমার শরীরেও নেই।'

'কে নিল?'

'কেউ একজন নিয়েছে এবং সঙ্গে তার পূর্বপরিকল্পিত সঙ্গীরা সাহায্য করেছে।'

'কামেল বাবা কোথায়?'

'এখন যেথায় আছে, সেথায়।'

বাইরে কাকা-কাকি, ফুফা-ফুফুর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝট করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গালু ভাই এক হাত যথাস্থানে রেখে আরেক হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'আমার এখন কী হবে রে?'

'যা হবে তা-ই।'

ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমি। কাকিকে দেখে মুচকি একটি হাসি দিলাম। তারপর ইশারা করে বললাম ঘরে যেতে। কাকি হেসে হেসে বললেন, 'কেমন?'

'তুমি বলেছিলে না, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' হাসতে হাসতে কাকি হাঁপাতে থাকেন।

'সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত কাকি গালু ভাইয়ের দিকে পা বাড়ান, পেছন পেছন ফুফা-ফুফু আর কাকাও। আমি কিছু শোনার আগেই হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরলাম।

প্রয়োজন

খুক করে কাশি দিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন, কাশির শব্দটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই ভাবতে লাগলেন, শব্দটা ভদ্রতার মধ্যে রইল, না অভদ্রতাজনিত হয়ে গেল, না দুটোর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়ে গেল! আপাতদৃষ্টিতে কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি, কেবল মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল প্রচ্ছন্ন কোনো ভাবনা, যা তিনি তিন বছর ধরে ভাবছেন, প্রতিদিন ভাবছেন, এখনো ভাবছেন।

খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বাসের পেছনের একমাত্র খালি থাকা সিটটাতে তিনি বসতে চাননি। বাসের ভেতরের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোঁকড়ানো চুলের এক অতিভদ্র যুবক তাকে অবিরত অনুরোধ করায় তিনি বসেছেন। যদিও রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা সবচেয়ে পেছনের সারির সিটে বসা—দু জায়গাতেই নিজেকে অনিরাপদ ভাবেন তিনি।

না, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দাঁড় করাতে পারলেন না তিনি। তার আগেই একটা স্পিডব্রেকারের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে বাসের স্পিড কমে যাওয়ায় স্পিড কমে যায় তারও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার বসে পড়েন এবং অলৌকিক ব্যাপার হলো, তিনি আবার কেশে ওঠেন। আগের বারের চেয়ে কাশির শব্দটা বেশি হওয়ায় তিনি এবার একটু চমকেই ওঠেন এবং আগের বারের মতো সংকুচিত হয়ে স্থির হয়েও থাকেন কিছুক্ষণ।

মাথা নিচু করে এতক্ষণ বসে ছিলেন তিনি। বাসটা আরো কিছুদূর যাওয়ার পর উঁচু করলেন মাথাটা। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো প্রথমে ডান দিকে ঘোরালেন একটু, ঠিক ততটুকুই, যতটুকু ঘোরালে কেবল চোখ দুটোই ঘোরে; ঠোঁট, নাক, ভ্রূ কিছুই ঘোরে না। ডান দিক থেকে সরিয়ে এবার বাঁ দিকে ঘোরালেন, এবারও কেবল চোখ দুটোই; ঠোঁট, নাক, ভ্রূ কিছুই ঘুরল না। চোখ দুটো আবার সামনের দিকে আনলেন তিনি। বাসটি চলছে। সবার মাথার ফাঁক দিয়ে, বাসের সামনের কাচ ভেদ করে, দৃষ্টিটা যত দূর নেওয়া যায়, তাতে কেবল বাসই চোখে পড়ে। চারদিকে কেবল বাস আর বাস।

আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বাসটা চলছে, দুলছে; চলছেন, দুলছেন তিনিও। দোল দোল অবস্থায়ই তিনি বাসের রডটা ধরে ফেললেন দু হাত দিয়ে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও রইলেন। তারপর এক পা এক পা করে এগোতে লাগলেন সামনের দিকে। কিন্তু তিন-চার পা এগিয়ে গিয়েই কার সঙ্গে যেন বাধা পেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো ছুটে গেল রড থেকে, তিনিও একটু ছিটকে গেলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাওয়ার আগেই পাশে থেকে কে একজন টেনে ধরলেন তাকে। অতি কষ্টে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আগের মতোই রডটা ধরে তিনি প্রথমে একটা ধন্যবাদ দিলেন লোকটাকে, তারপর আস্তে আস্তে পেছনে তাকিয়ে কার সঙ্গে বাধা পেয়েছেন সেটা দেখার চেষ্টা করলেন। ভালো করে তাকিয়েও তিনি কোনো কিছু খুঁজে পেলেন না, কেবল পাশ থেকে একজন বললেন, 'স্যরি', তারপর সিট থেকে বের হয়ে থাকা পা'টি আরো একটু সিটের ভেতর ঢোকালেন।

মুচকি হাসলেন তিনি। বাসের ভেতর তো অনেকেই কিছুটা পা ছড়িয়ে বসে, বরং তারই একটু ভালো করে দেখে চলা উচিত ছিল, সাবধানে পা ফেলা উচিত ছিল।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি আরো একটু। তারপর আবার চলতে লাগলেন। বাসের মাঝখানে খালি জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে থাকা দু-একজনকে পাশ কাটিয়ে তিনি বেশ সাবধানেই এগিয়ে যাচ্ছেন। লম্বা বাসটার দু-তৃতীয়াংশ এসে তিনি আর পা বাড়ালেন না, দাঁড়িয়ে পড়লেন একটু, সামান্য হাঁপাতেও লাগলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি একটুক্ষণের জন্য বুজে ফেললেন চোখ দুটোও।

চোখ মেলে তাকানোর পর তিনি খেয়াল করলেন তার চশমাটা একটু নাকের ওপর ঝুলে এসেছে। এক হাত দিয়ে রড ধরে আরেক হাত দিয়ে কায়দা করে সে ঝুলে পড়া চশমাটা ঠিক করতে করতে তিনি প্রতিদিনের মতো অনুভব করলেন—বি এম আবুল বাশার, জন্ম : ১৯৩৫, মাস : নভেম্বর, তারিখ : ১৪, রোজ : সোমবার, সময় : ভোর ৫ ঘটিকা—না, এই তিনি আর আগের মতো নেই। চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন, ভাঁজ হয়ে গেছে দেহের সব জায়গার চামড়া, চুল পেকে গেছে প্রায় সবগুলো, যদিও অলৌকিকভাবে টিকে আছে মুখের সব কটা দাঁত। সব মিলিয়ে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি অনেক আগেই।

বাশার সাহেব তার সুদৃশ্য ফ্রেমের চশমাটা আরো একটু উঁচু করে ধরলেন, এমনি। নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এ অনুধাবনে চোখ দুটো শিরশির করে ওঠে তার। কাছের মানুষগুলোর অনেকেই এ পৃথিবী থেকে চলে গেছে, তিনিও চলে যাওয়ার পথে—একদিন নিঃসীম শূন্যতা, বুকের ওপরের মাটিতে ক্রমান্বয়ে কচি ঘাস বেড়ে ওঠা, ঘাসের নীল ফুল, সে ফুল ঝরে পরা, মাটিতে মিশে যাওয়া, তারপর একদিন তারও মিশে যাওয়া।

WWW.BANGLAPDF.COM

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাশার সাহেব আবার এগোতে থাকেন। কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর আবার থেমে যান। কারণ আর কিছুদূর যাওয়ার পর বাসটা থেমে যাবে সামনের স্টপেজে, তার পরের স্টপেজে নেমে যাবেন তিনি।

বাসটা থেমে গেল। দু-একজন নেমে যাচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসের কন্ডাক্টর বলল, 'চাচা, একটু জলদি নামেন।' তারপর ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওস্তাদ, মুরব্বি আছে।'

'না না, আমি পরের স্টপেজে নামব।' বাশার সাহেব কন্ডাক্টরের দিকে ভালো করে তাকালেন, যুবক বয়সী। অদ্ভুত ধরনের একটা শার্ট পরেছে সে, শার্টের বুকের কাছটার সবগুলো বোতামই খোলা, খোলা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গলায় একটা কালো সুতোর মালা পরেছে সে, একটা লকেটও আছে তার সঙ্গে। থুতনির নিচে অল্প কিছু দাড়ি আছে তার, ঠিক হুজুরীয় দাড়ি নয়, কয়েক দিন না কাটার দাড়ি। ডান হাতের কবজিতে একটা লাল রঙের প্লাস্টিকের ব্যান্ড পরা তার, আর বাঁ হাতের আঙুলের মাঝখানে কায়দা করে

ধরে আছে বেশ কিছু টাকা। খালি-পা, পরনের প্যান্টটার নিচের অংশ অনেক উঁচু করে গোটানো। সবচেয়ে দেখার বিষয় হচ্ছে-সে অনবরত পান চিবোচ্ছে, সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে সে চিবোনো পানের রসে।

বাশার সাহেব খুব নরম স্বরে বললেন, 'আমার টাকাটা?'

কন্ডাক্টর পান চিবোনো বাদ দিয়ে কিছুটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'কিসের টাকা?'

'কিসের টাকা মানে!' বাশার সাহেব কপাল কুঁচকে ফেললেন, 'তোমার ভাড়া তো সাত টাকা।'

'তো?' কন্ডাক্টর তার ডান হাতের একটা আঙুল মুখে ঢুকিয়ে কিছুটা চিবোনো পান বের করে সেগুলো আবার মুখে ঢুকিয়ে বলল, 'ভাড়া তো ছাত ট্যাকাই।'

'কিন্তু আমি তোমাকে দিয়েছি একশ টাকা। ভাংতি নেই বলে টাকাটা নিয়ে তুমি বলেছিলে নেমে যাওয়ার সময় বাকি টাকাটা ফেরত দেবে আমাকে।'

'এইটা আপনি কী কইতাছেন!'

'কেন, আমি কি ভুল বলছি।'

'অবছ্যই, আপনি ভুল কইতাছেন মানে কি, একছোর মদ্যে একছো ভুল কইতাছেন।'

'ভুল!' বাশার সাহেব কিছুটা চমকে ওঠেন।

'হ্যাঁ, ভুল।'

'নো নো, আমি মোটেই ভুল করছি না, ভুল করছ তুমি।'

কন্ডাক্টর বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাস থেকে নামার শেষ ধাপ থেকে ওপরের ধাপের উঠে এলো। তারপর বুক ফুলিয়ে বাশার সাহেবের একেবারে শরীর ঘেঁষে দাঁড়াল কিছুটা। কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বুড়া অইলে তখন আর মানুষের মাতায় গিলু থাকে না। চাচা, আপনের মাথায়ও গিলু নাই, তাই ছবকিছু ভুল করতাছেন।'

'এভাবে কথা বলছ কেন তুমি?'

'এভাবে কমু না তো কীভাবে কমু?'

'ভদ্রভাবে বলো।'

'অইছি কন্টাক্টর মানুছ, বদ্রভাবে বলি কেমতে!'

'ঠিক আছে, তুমি আমার টাকা ফেরত দাও, আমি সামনের স্টপেজে নামব।'

'কিয়ের ট্যাকা চাইতাছেন আপনে, অ্যা!'

'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে না প্লিজ, আমি একজন ভদ্রলোক মানুষ।'

'আপনের মতো ভদ্রলোক মানুছ এই বাসে অনেক উঠে প্রতিদিন, প্রতিদিনই তাগো চাইয়া চাইয়া দেহি।'

'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না, তুমি আমার টাকাটা দিয়ে দাও।'

'আবার কয়! কিয়ের ট্যাকা, ওই মিয়া কিয়ের ট্যাকা। দেইখা বদ্রলোকই মনে অয়, কিন্তু কথা কইতাছেন এক্কেরে চিটারের মতো।'

'কী বললে! এই ছেলে, আমি তোমার বাবার বয়সী।'

'বাবার বয়সী অইছেন তো কী অইছে, চুম্মা দিমু?'

'শাট-আপ।' বৃদ্ধ লোকটা একটু শব্দ করে বলেন।

বাসের ড্রাইভার সিগারেটে একটা টান দিয়ে বেশ ভাব নিয়ে একবার এদিক তাকিয়ে আবার ফিরে তাকাল ডান দিকে। তিনজন হিজড়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপাশ দিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আয়েশ করে আরেকটা টান দিল সিগারেটে, তারপর হিজড়ে তিনজন মানুষের ভিড়ে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়েই রইল।

'ওস্তাদ?'

কন্ডাক্টরের ডাকে ড্রাইভার বেশ অনিচ্ছা নিয়ে এদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী অইছে?'

'দেহেন না, এই বুড়ায় কি কয়?'

'কী কয়, সেইটা আমি কি জানি, তুই আছোস কিয়ের লাইগা?' ড্রাইভার বাসটি ছেড়ে দিল।

'ওই মিয়া, চিটারি বাদ দ্যান।' কন্ডাক্টর এবার একটু ধাক্কা দিয়ে বসল বৃদ্ধ মানুষটাকে। ধাক্কাটা সামান্য ছিল বটে, কিন্তু বৃদ্ধের জন্য সেটা ছিল অসহনীয়। চলন্ত গাড়ি, তার ওপর বুড়ো মানুষ, ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে তিনি গোড়াকাটা গাছের মতো প্রায় ধীর গতিতে পড়ে গেলেন একটা

যাত্রীর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আরেকটা যাত্রী কিছুটা লাফিয়ে উঠে কন্ডাক্টরকে বললেন, 'ওই ইডিয়ট, এটা কী করলি?'

'কী করছি?' কন্ডাক্টর কিছুটা তেড়ে এগিয়ে আসে যাত্রীটির দিকে।

'দেখেছেন, দেখেছেন, কী বেয়াদব ছেলে!' যাত্রীটি অন্য যাত্রীদের দিকে সহানুভূতি পাওয়ার দৃষ্টিতে তাকান। বাসের বাঁ পাশ থেকে পাঞ্জাবি পরা অল্প বয়সী এক যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ওই ছ্যাড়া, তুই বেশি বাইড়্যা গ্যাছস, এতক্ষণ ভরা তা-ই দেখলাম।'

'দেখছেন ভালো করছেন।'

'কী বললি?' পাঞ্জাবি পরা যাত্রীটি তার সিট থেকে কিছুটা লাফিয়ে উঠে কন্ডাক্টরের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একজন বয়স্ক মানুষকে তুই ফেলে দিয়েছিস, আবার বেয়াদবের মতো কথা বলছিস! এক থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'

'এতই সহজ, দ্যান তো দেহি!' কন্ডাক্টর গাল পেতে দেওয়ার মতো করে আলতোভাবে মাথাটা একটু কাত করে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীটি ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরে দেয় কন্ডাক্টরের গালে। কিন্তু তাতে একটুও দমে না গিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে যাত্রীটির দিকে তাকায় সে। পাঞ্জাবি পরা যাত্রীটি এবার একটা আঙুল উঁচু করে বলে, 'আর একটা কথা বলবি তো চোখ তুলে ফেলব তোর।' কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'ফালান, হারামজাদার চোখ তুলে ফালান। যত বড় মুখ না তত বড় কথা!'

সামনের স্টপেজ এসে গেছে। বাস থামিয়ে ড্রাইভার বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'এত হাউকাউ কিসের, কী অইছে?'

ড্রাইভারের পেছনে বসা এক যাত্রী বললেন, 'কী হয়েছে শোনেন নাই?' পাশে বসানো বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে যাত্রীটি বললেন, 'এই মুরব্বিরে আপনার পোলা ধাক্কা দিয়া ফেলে দিছে, আবার পোংটার মতো কথা বলছে।'

'ওই আক্কাইছ্যা, এইসব কি শুরু করছস?'

কন্ডাক্টর আক্কাস বেশ রাগী গলায় বলল, 'ওস্তাদ, এই বুড়ায় কয় কি, আমারে নাকি সে একছো ট্যাকার নোট দিছে!'

'হ্যাঁ দিয়েছে।' বাশার সাহেবকে পেছনের সিটে বসতে অনুরোধ করা কোঁকড়ানো চুলের সেই অতিভদ্র যুবকটি পেছন থেকে উঠে এসে সামনে

দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার পাশে বসেছিলেন মুরব্বি, আমার সামনে তোকে একশ টাকার একটা নোট দিয়েছে। তোর কাছে ভাংতি ছিল না বলে তুই সাত টাকা ভাড়া রেখে বাকি তিরানব্বই টাকা পরে দিতে চেয়েছিস।'

'এই মুরব্বি ভদ্রলোক আপনার সামনে ওকে একশ টাকার নোট দিয়েছেন?' পাশে বসা এক যাত্রী বেশ উৎসুক হয়ে কথাটা বললেন।

'জি, আমার সামনে দিয়েছেন।' অতিভদ্র যুবকটি পাশের যাত্রীটির দিকে তাকালেন।

'আপনি মিছা কন ক্যা।' কন্ডাক্টর বেশ চড়া গলায় বলে।

'দেখেছেন, কত বড় জোচ্চর।' পাঞ্জাবি পরা যাত্রীটি কন্ডাক্টরের দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে অতিভদ্র যুবকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ভদ্র ছেলেটির সামনে ওকে টাকা দিয়েছেন মুরব্বি সাহেব, এ কথা বলতেই ছেলেটাকে আবার মিথ্যাবাদী বলছে! কত বড় স্পর্ধা!'

'অত কথা বাদ, আমি সামনের স্টপেজে নামব। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, অনেকক্ষণ ধরে বাসটা থেমে আছে।' অতিভদ্র যুবকটি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ড্রাইভার সাহেব, তাড়াতাড়ি ফয়সালা করে বাসটা ছাড়ুন।'

ড্রাইভার একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'এখন থাক, লাস্ট স্টপেজে গিয়া একটা ফাইস্‌লা করমুনি, ওইহানে আমগো আরো লোকজন আছে, কোনো অছুবিদা অইব না।'

'মুরব্বি নামবেন এ স্টপেজে, আর আপনি তাকে নিয়ে যেতে চাইছেন লাস্ট স্টপেজে, এটা কেমন কথা হলো!' পাশ থেকে আরেকজন যাত্রী বললেন।

আবার অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ঠিক কথা বলেছেন আপনি। যা করার এখানেই করতে হবে।'

ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ রাগী গলায় বলল, 'শালার ব্যাটা আক্কাইছ্যা, মুরব্বিরে বাকি ট্যাকা দিয়া দে। ঝামেলা ছ্যাছ কর।'

'ওস্তাদ, এটা আপনি কী কইতাছেন?'

'কী কইতাছি বোঝোস না? দিয়া দে শালা, পরে দেহুমনে আমি।'

খুব মন খারাপ করে আঙুলের সঙ্গে থুতু লাগিয়ে টাকা গুনতে লাগল আক্কাস। প্রায় অচল হওয়া দুটো দশ টাকার নোট দিয়ে তিরানব্বই টাকা

গুনে বাশার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, 'ভালোই দেহাইলেন মুরব্বি! লন, এইবার ট্যাকাটা গুইনা লন।'

বাশার সাহেব টাকাটা গুনলেন না, যত্ন করে পকেটে ঢুকিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে বাস থকে নামতে লাগলেন। শেষ ধাপে নামার আগে তিনি একটু থামলেন এবং একটু ঘুরে তাকিয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'থ্যাংকু।'

বাশার সাহেব মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাসটি চলতে শুরু করল, কিন্তু তিনি যদি এ সময়টাতে বাসটার দরজা বরাবর লক্ষ করতেন, তাহলে দেখতেন—দু চোখে আগুন আর সারা মুখে ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে আক্কাস।

রাস্তার পাশে একটা নিরাপদ জায়গায় এসে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন বাশার সাহেব। একটু একটু হাঁপাচ্ছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পায়ে হাঁটা শুরু করলেন আবার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এই সময়টাতে অদ্ভুত কিছু চিন্তা আসে তার মাথায়। কখনো কখনো একদম ফাঁকা হয়ে যায় মাথাটা।

পাড়ার মোড়ের ওষুধের দোকানে এসে আগে কয়েকটা ওষুধ কেনেন বাশার সাহেব। তারপর কাঁচাবাজারে গিয়ে কিছু সবজি আর ছোট মাছ কেনেন। মাছগুলো থেকে কেমন যেন পচা গন্ধ বের হচ্ছে, তবু কেনেন। অসুস্থ বউটা ছোট মাছ দিয়ে ভাত খেতে চেয়েছে।

বাসায় পৌঁছে সবজি আর মাছগুলো বারান্দায় রেখে ঘরে ঢুকতেই বিছানা থেকে উঠে বসলেন বাশার সাহেবের স্ত্রী। আঁচলটা টেনে শব্দ করে কেশে উঠে তারপর বললেন, 'আজ এত দেরি করলেন যে?'

'আজ একটু হাতে কাজ ছিল বেশি।' স্ত্রীর পাশে বসতে বসতে কথাটা বলেন বাশার সাহেব।

'দোলন-তপুদের একটু দেখতে গিয়েছিলেন?'

'না।'

'আপনার দু ছেলে নাহয় আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, নাতি-নাতনিদের তো কোনো দোষ নেই।'

'না, ওদের কোনো দোষ নেই। তুমি তো জানো তিন বছর ধরে আমি কেবল একটা কথাই ভাবছি, কবে দোলন-তপু বিয়ে করবে, তারপর বউকে

সঙ্গে নিয়ে ওরা ওদের বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ওদের নয়, ওদের বাবা-মাকে দেখতে যাব একটু।'

'এভাবে আপনি কথা বলবেন না তো!'

'অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি আজকাল কথা বলাও ভুলে গেছি শিহাবের মা।'

'থাক, আপনাকে আর কথা বলতে হবে না। চলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি। সারা দিন কি-না-কি খেয়েছেন। আচ্ছা, আপনি তো আমাকে এক দিনও বললেন না এ তিন বছর ধরে আপনি কী করছেন, কীভাবে আমাদের এ দুজনের সংসারটা চালাচ্ছেন?'

'কিছু তো একটা করিই।' বাশার সাহেব ম্লান হেসে নিচু করে ফেলেন মাথাটা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলেন, 'তুমি কি বলতে পারবে, ছেলে-মেয়েরা বড় হলে বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায় কেন?'

বাশার সাহেবের স্ত্রী কিছু বলার আগেই ঘরের বাইরে থেকে শব্দ আসে, 'আংকেল?'

ঘর থেকে বের হন বাশার সাহেব। বারান্দার পাশে কোঁকড়ানো চুলের সেই অতিভদ্র ছেলেটা দাঁড়িয়ে। কিছুটা ইতস্তত করে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'আজ মোট কত কামাই হলো আংকেল?'

'লাস্ট তিরানব্বই টাকা নিয়ে মোট দুই শ সাতাশি টাকা। লন্ড্রিওয়ালাকে গায়ের এ জামাটার ভাড়া দিতে হবে পনের টাকা, মোড়ের মুচিকে পায়ের এ চকচকে জুতোটা বাবদ বারো টাকা, আর এ দামি চশমাটা কিনেছিলাম তিন শ বিশ টাকা দিয়ে, তার কিস্তি পঁচিশ টাকা, মোট বায়ান্ন টাকা খরচ। অ, আরো একটা খরচ আছে। এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট খেয়েছিলাম আমি, এতে খরচ হয়েছে পাঁচ টাকা। তাহলে মোট খরচ দাঁড়াল সাতান্ন টাকা।'

'দুই শ সাতাশি টাকা থেকে সাতান্ন টাকা বাদ দিলে থাকে দুই শ ত্রিশ টাকা। সে টাকার অর্ধেক একশ পনেরো টাকা। টাকাটা দেন, চলে যাই।'

বাশার সাহেব টাকাটা হিসাব করেই রেখেছিলেন। পকেট থেকে বের করে টাকাটা ছেলেটাকে দিতে দিতে বলেন, 'কাল থেকে এ কাজটা আর করব না রে, বড্ড খারাপ লাগে।'

'এ কথাটা তো এর আগে আপনি আরো কতবার বলেছেন! বলা যায় প্রতিদিনই বলেন, কিন্তু পকেটের টাকা শেষ হলেই তো আবার...।' মুচকি একটা হাসি দিয়ে ছেলেটি বলে, 'কাল কিন্তু অন্য লাইনের বাসে উঠতে হবে।'

মুচকি হাসি মুখে নিয়েই ছেলেটি চলে যায়। বাশার সাহেব অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ছেলেটির দিকে, চোখ দুটো আগের মতোই ঝাপসা হয়ে আসে তার।

মুখোশ

দৃশ্যটা দেখে ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলেন কামরান মির্জা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে ফেললেন তার চোখ দুটো। মনে হলো গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন। কিন্তু একটু পরই চোখ দুটো খুলে আবার সামনের দিকে তাকালেন তিনি। বড় রাস্তার পাশে, ডাস্টবিনটার কাছে পড়ে আছে অপরিণত এক শিশু। মৃত। চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রুশের মতো। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত, খুবলে খাওয়া পেট। ছোট্ট ভুঁড়িটা স্থির হয়ে আছে পেটের ভেতর, বাচ্চাদের বলের মতো। চোখের মণি দুটো উধাও। ছোট ছোট লাল পিঁপড়ের দল সেখানে উৎসবে মেতেছে। বীভৎস!

শিশুটার চারপাশে জমাট বেঁধে যাওয়া চাপ চাপ রক্ত, তুলো এবং কয়েক টুকরো কাপড়। ডাস্টবিনটার কিনারে বসে কা কা করে চিৎকার করছে বেশ কয়েকটা কাক। ডানা ঝাপটাচ্ছে সশব্দে। একটি দুটি করে বাড়ছে কাকের ভিড়। এরই মধ্যে একটি কাক উড়ে এসে শিশুটির পাশে দাঁড়ায়। শিশুটির শরীরে ঠোকর দেবে কি দেবে না এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় ভুগছে সে। কিন্তু কাকটিকে সিদ্ধান্তহীনতায় রেখেই হঠাৎ কোথা থেকে একটি কুকুর এসে হামলে পড়ে শিশুটির ওপর। ঘাড়ের একপাশে কামড়ে ধরে শিশুটিকে নিয়ে দ্রুত দৌড়ে পালায় পাশের গলির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা শরীরটাকে সোজা করলেন মির্জা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গলিটার দিকে, করুণ চোখে, অনেকক্ষণ।

পিঁপড়েগুলোর উৎসব, কাকটির সিদ্ধান্তহীনতা এবং কুকুরের নিষ্ঠুরতা—কিছুই যেন মির্জাকে উদ্বেলিত করে না; তিনি ডুবে আছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিন্তায়।

'কার পাপে গো!'

মির্জা পাশ ফিরে তাকালেন। রাশভারী চশমার আড়ালে ছলছল করে উঠল চোখ দুটো। ভেজা চোখেই মহিলাটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি। ডাস্টবিনটার দিকে তাকিয়ে আছে মহিলাটি। দুই চোখে রাজ্যের মায়া, কিছুটা বিষণ্ন। মির্জা বুঝলেন, মহিলাটিও কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া নির্মম দৃশ্যের দর্শক। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মহিলাটি এগিয়ে এল। অবাক হয়ে ডাস্টবিনটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ভগবান, তোমার লীলা বোঝা ভার। কেউ চেয়েও পায় না, কেউ ফেলে দেয়।'

মহিলাটি ডাস্টবিনের আশপাশে ঝাড়ু দেওয়া শুরু করেছে। মির্জা তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। হঠাৎ ছোট্ট একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠল মির্জার শরীর। সেটা শীত, নাকি কিছুক্ষণ আগে দেখা অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের কারণে, বোঝা গেল না।

ধাতস্থ হয়ে আশেপাশে তাকালেন তিনি। সুখী সুখী চেহারা আর চর্বিযুক্ত শরীর নিয়ে মর্নিং ওয়াকে মানুষ ব্যস্ত। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অবিশ্রান্ত কৌশল। মির্জা আর দাঁড়ালেন না। তিনিও সেই কুশলীদের মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

'আংকেল, আমরা তাহলে এখন যাই?'

চমকে ওঠেন মির্জা। থমকে দাঁড়ান। দ্রুত পেছনের দিকে তাকান। ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, ওরাই তাকে ডেকে এনেছে বাসা থেকে।

গম্ভীর ও চিন্তিত মুখটা স্বাভাবিক করলেন মির্জা। এগিয়ে এলেন। ছেলেগুলোকে তিনি চেনেন। তার প্রতিবেশী। বয়সে সবাই যুবক। নাম জানতেন না। সকালে যখন তাকে ডাকার জন্য বাসায় যায়, তখন জেনে নিয়েছেন।

কিছুটা ইতস্তত কণ্ঠে মির্জা বললেন, 'তোমরা কিছু ভেবেছ?'

'জি আংকেল।'

স্মিত হাসি ফুটে ওঠে মির্জার ঠোঁটের কোণে। আলতোভাবে শিহাবের কাঁধে হাত রাখেন, 'বিষয়টা খুব নাজুক শিহাব। কিছুটা...'। কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে যান তিনি। কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভেবে বলেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করাটা মুশকিল। তবে তোমাদের মতো সচেতন ছেলেরা এগিয়ে এসেছ, প্রতিরোধ চাইছ, দেখে খুব ভালো লাগছে।'

'একটু খেয়াল করলেই কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। একটা অবৈধ বাচ্চা জন্ম নিল, প্রথমত সেটা একটা পরিবারের জন্য বিব্রতকর। তারপর বাচ্চাটা যখন রাস্তায় ডাস্টবিনের পাশে পড়ে থাকে, আশপাশের সবার জন্য সেটা আরও বিব্রতকর।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে।'

'তা ছাড়া আংকেল...।' শিহাবের পাশে এসে দাঁড়ায় সাদী, 'আজ বড় রাস্তার পাশে একটি মৃত শিশু, কাল আমাদের অথবা আপনার বাসার সামনে, ক্রমান্বয়ে হয়তো সবার বাসার সামনেই এভাবে অজ্ঞাতপরিচয় শিশু পড়ে থাকতে দেখা যাবে।'

'হুঁ, মনে হচ্ছে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।' মির্জা মৃদু মাথা নেড়ে সায় জানান।

'শিহাবদের বাসার সামনেও এ রকম একটি বাচ্চা পাওয়া গিয়েছিল, বেশ কয়েক দিন আগে। শিহাব বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওর কথা ভেবে আংকেল আর আন্টি সেদিন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, তারা এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন।' বলতে বলতে সাদীর ফরসা মুখ লাল হয়ে যায়।

নিচু হয়ে থাকা মাথাটা সামান্য উঁচু করে মির্জা ওদের দিকে তাকালেন। তারপর সংকোচ নিয়ে বিব্রত হয়ে বললেন, 'বড় জঘন্য কাজ, কী ধরনের ফ্যামিলিতে যে এসব হয়! তোমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে বেশ লজ্জাই লাগছে আমার।'

শিহাব ও সাদীর দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে মির্জার দিকে ফিরল কবীর। কিছুটা উঁচু গলায় বলল, 'অনেক হয়েছে। আর বাড়তে দেওয়া যায় না। যত দ্রুত সম্ভব এ ব্যাপারটার সমাধান হওয়া দরকার।'

মির্জাও একমত পোষণ করেন, 'ঠিকই বলেছ।'

'আংকেল, আপনি আমাদের এলাকার সবচেয়ে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ। আপনাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা কাজটা করতে চাই।' কবীরের কণ্ঠ

উত্তেজিত।

'কিন্তু আমি অসুস্থ মানুষ, শরীরটা ইদানীং আরও খারাপ যাচ্ছে। তা ছাড়া...।'

মির্জাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সাদী বেশ গম্ভীর মুখে বলল, 'এলাকায় স্বল্পসংখ্যক সৎ লোকের মধ্যে আপনি একজন। টাকা-পয়সা, সম্মান, প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই অভাব নেই আপনার। আপনি যদি একটু এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের জন্য কাজটা সহজ হবে।'

সাদীর আবদারসমেত আবেদন শুনে মির্জা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এমন একটা ব্যাপারে ছেলেরা তার সহযোগিতা চাইছে, সরাসরি 'হ্যাঁ'ও বলতে পারছেন না, আবার 'না' বলাটাও মুশকিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হাতঘড়িটা দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা এক ঘণ্টা পর হাজি মোতালেব সাহেবের বাসায় এসো, দেখি কী করা যায়।'

ছেলেগুলো চলে গেল। মির্জা সেভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে। উদাস দৃষ্টি। ভাবনায় মগ্ন।

কিছুক্ষণ পর মির্জা হাঁটা শুরু করলেন। বড় রাস্তায় পা রেখেই নিঃশ্বাস নিলেন বুকভরে। বুকটা ধুকধুক করছে। বাঁ পাশটায় ব্যথাও লাগছে একটু। প্রবলেমটা বাড়ল না তো? গত মাসে সিঙ্গাপুর থেকে চেকআপ সেরে আসার পর বেশ কয়েক দিন তো ভালোই লাগল। আজ হঠাৎ কেন যে এমন লাগছে!

ইদানীং রাতে ঘুমও ভালো হচ্ছে মির্জার। আগে দুটো ট্যাবলেট খেতে হতো, এখন একটাতেই চলে। যদিও তিনি ঘুমান খুব কম। সারা দিন অফিসে ব্যস্ততার পর বাসাতেও অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। যদিও কাজগুলো সব সময় খুব জরুরি নয়, তবু।

কোনো কোনো রাতে আবার একদম ঘুম হয় না। নির্ঘুম রাত কাটানোর যে অস্থিরতা, তেমন কোনো সমস্যা অবশ্য হয় না; বরং ভালোই লাগে। নিশ্চুপ রাতে নিশ্চিন্তে অনেক কিছু ভাবা যায়। কত কথা, কত স্মৃতি এসে যে মনের কোণে কড়া নাড়ে! অতীতের অনেক ঘটনা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। সেসব স্পষ্ট দেখতে পান মির্জা। আচ্ছা, মুনাদটা এখন কেমন আছে? মুনাদ! দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মির্জা। তাঁর খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল মুনাদ। যৌবনে এ বন্ধুটাকে আদর্শ মানতেন তিনি। কী পারত না মুনাদ! সব ধরনের খেলায় সেরা সে। তর্ক-বিতর্ক, দুষ্টুমি, এমনকি পড়ালেখা—সব

জায়গায়। 'ভালো ছাত্র কখনো ভালো খেলোয়াড় হয় না'—প্রচলিত এই কথাটি মিথ্যে প্রমাণ করেছিল মুনাদ। তাই বেশ হিংসে হতো ওকে। বন্ধু তো বটেই, কত বান্ধবী ছিল ওর! সে তুলনায় মির্জার থলে ছিল শূন্য। হিংসে না করে উপায় আছে?

কয়েক দিন ধরে একটা ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করবেন তিনি। বৃদ্ধাশ্রম অথবা দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল কিংবা এতিমখানা...। আজকাল অনেকেই এসব কাজে নিজেকে জড়াতে চান। অবশ্য এর পেছনে যতগুলো উদ্দেশ্য থাকে, তার মধ্যে প্রধান হলো, নিজেকে, নিজের নামকে বাঁচিয়ে রাখা। বড় অদ্ভুত মানুষের বেঁচে থাকার শখ। হায় মরণশীল মানুষ! মির্জা আপন-মনে হাসতে থাকেন।

২

WWW.BANGLAPDF.COM

রাস্তায় মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সবার ব্যস্ততা দেখে একরকম করুণাই হয়। সামনেই পার্ক। মির্জা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পার্কের ভেতর অনেক লোক। প্রায় সবাই জগিং করছে। মোটা একটি গাছের গোড়ার একজন যুবতী মেয়েকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল। অল্পক্ষণের জন্য মির্জা দাঁড়িয়ে পড়লেন। টকটকে লাল ফিতা দিয়ে চুল বাঁধা মেয়েটির। দু হাতে চারটি করে নীল চুড়ি। ঠোঁটে হালকা গোলাপি রঙের সস্তা লিপস্টিকের উপস্থিতি। চেহারাটা কেমন যেন ফ্যাকাসে। গভীর মনোযোগে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করলেন মির্জা। পাশেই মেয়েদের জামার একটা ছেঁড়া অংশ পড়ে থাকতে দেখে কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন তিনি।

'মির্জা সাহেব।'

সামান্য চমকে উঠে ডানে তাকান মির্জা। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুশীল ব্যানার্জি। আলতো হেসে মির্জা এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

'কী ব্যাপার মির্জা সাহেব? এখানে...?'

মির্জা চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে ভালোভাবে মুছে আবার চোখে পুরে তাকালেন সুশীল ব্যানার্জির

দিকে। হাসিমুখ করে বললেন, 'মানুষ দেখছিলাম মি. ব্যানার্জি। দেখছিলাম মানুষের অসহায়ত্ব।'

'কী হবে আর দেখে, জগৎটাই তো ভরে গেছে এসবে।'

'খারাপ লাগে খুব।'

'কোনো লাভ নেই মির্জা সাহেব, শুধু শুধু নিজে কষ্ট পাওয়া।'

'তবুও...'

'ও ভালো কথা— ।' কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় মির্জাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ব্যানার্জি বললেন, 'সকালে এদিকে আসার পথে বড় রাস্তার সামনে, ডাস্টবিনটার পাশে একটা বাচ্চা দেখেছিলাম, মৃত।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'

'কিছু বুঝলেন?'

মাথাটা এদিক-সেদিক নাড়িয়ে মির্জা বললেন, 'নাহ্, কী বুঝব।'

'আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।' আশপাশে তাকিয়ে যেন ভীষণ গোপন কোনো খবর জানাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে প্রায় ফিসফিস করে ব্যানার্জি বললেন, 'কাল রাত আড়াইটা-তিনটার দিকে বাথরুম সেরে কিছুক্ষণের জন্য বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রফেসর জহির সাহেবকে একটা পোঁটলা হাতে নিয়ে ডাস্টবিনটার দিকে যেতে দেখেছি।'

'অন্য কিছুর পোঁটলাও তো হতে পারে।'

'তা পারে বৈকি। তবে এত রাতে!' একটু থেমে ব্যানার্জি বললেন, 'ওনার মেয়েগুলোর স্বভাব-চরিত্র আমার কাছে ভালো বলে মনে হয় না। তাদের উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা বেশ চোখে লাগে। দুটো মেয়েরই বিয়ের বয়স পার হতে চলেছে, অথচ...।' হঠাৎ আকাশের দিকে চোখে তুলে বললেন, 'ভগবানই জানেন কার মনে কী।'

'থাক এসব। অন্য কেউ শুনলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

'আপনার মনে আছে, গত বছর ঠাকুরবাড়ির মেয়েটিকে নিয়ে কী কাণ্ড হলো? ব্যাপারটা এ এলাকার সবাই জানে। অবৈধ বাচ্চা প্রসব করাতে গিয়ে মেয়েটার যায় যায় অবস্থা।'

'আহ্, এসব থাক ব্যানার্জি মশাই।'

'কী বলছেন, থাকবে কেন? সমাজে বাস করতে হলে এসবের প্রতিকারে এগিয়ে আসা উচিত। তা ছাড়া ইদানীং কানে আসছে হাজি

মোতালেব সাহেবের বড় ছেলে নাকি কী সব স্মাগলিং-টাগলিংয়ের ব্যবসা করছে। উনি তো সুযোগ পেলেই মানুষকে হেদায়েত করে বেড়ান, ধর্মের দাওয়াত দেন, সৎ পথের কথা বলেন। কই, নিজের সংসারের মানুষদের যে হেদায়েত প্রয়োজন, সেটা বোঝেন না?'

'ব্যানার্জি মশাই', মির্জা আবার চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বলেন, 'সকালে আমার কাছে তিনটা ছেলে এসেছিল। এ পাড়ারই। একটা সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সহযোগিতা। আমি ওদের হাজি মোতালেব সাহেবের বাসায় আসতে বলেছি। আপনারও একটু ওখানে থাকা প্রয়োজন।'

'সমস্যাটা কী?'

'আগে চলুন হাজি সাহেবের বাড়িতে, সবকিছু জানতে পারবেন।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি চলে যান। আমি একটা কাজ সেরে এখনই আসছি। আচ্ছা প্রফেসর সাহেবকে খবর দিলে ভালো হয় না?'

'হ্যাঁ, ওনারও থাকার প্রয়োজন আছে।'

'ঠিক আছে, আমি আসার পথে প্রফেসর সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসব।'

সুশীল ব্যানার্জি চলে গেলেন। একা একা অনেকক্ষণ হাঁটলেন মির্জা। বুকের ব্যথা অনেকটা কমে এসেছে। ডান হাত দিয়ে বুকের বাঁ পাশটায় চাপ দিয়ে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন, একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

পা দুটো হালকা ব্যথা করছে। একটু বসা দরকার। পার্কের কোনায় একটা খালি বেঞ্চ দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। চারটা শালিক অদ্ভুত শব্দে ঝগড়া করছে। বেঞ্চে বসে তিনি একদৃষ্টিতে শালিকদের ঝগড়া দেখতে লাগলেন। বিষয়বস্তু বুঝতে পেরে ভাবলেন, প্রতিটি প্রাণী ঝগড়া করে শুধু খাবার নিয়ে। আর মানুষ? কী নিয়ে যে ঝগড়া করে না, সেটাই ভাববার বিষয়! মির্জার গম্ভীর মুখটা আপনা-আপনি হাসিতে ভরে গেল।

দূরে একটা গাছে থেকে অচেনা এক পাখির ডাক ভেসে আসছে। মাঝেমধ্যে বিরতি নিয়ে ডাকছে পাখিটা। এটা বাংলা সনের কী মাস? আচ্ছা, বসন্ত কি এসে গেছে, না এরই মধ্যে চলে গেছে? আনমনে আবার হেসে ওঠেন মির্জা। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালি জাতিই মনে হয় তাদের নিজস্ব সন, মাস, তারিখ ও ঋতুর কথা খেয়াল রাখে না। অদ্ভুত!

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পার্কের উত্তর পাশের রাস্তার দিকে হাঁটতে

লাগলেন। এ রাস্তাটা বেশ নির্জন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। এ রাস্তা দিয়ে গেলে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণে ছেলেগুলো হাজি সাহেবের বাসায় এসে গেল কি না।

শরীরটা ঘেমে গেছে। মির্জা দ্রুত পা চালালেন। ১২-১৫ মিনিট লাগবে হাজি সাহেবের বাসায় পৌঁছতে। রিকশা নেওয়ার কথা ভেবেই পরক্ষণে তা বাতিল করে দিলেন। ডাক্তার যথেষ্ট পরিমাণ হাঁটতে বলেছেন। কিন্তু সেভাবে হাঁটাহাঁটি করা হচ্ছে না। অফিস আর বাসাতেই কেটে যায় দিনের সবটুকু সময়।

হাজি সাহেবের বাসার গেটের সামনে এসে পড়েছেন। কলবেলে চাপ দিতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলেন। মাথাটা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর হাত তুলে চাপ দিলেন কলবেলে।

দারোয়ান সম্ভবত গেটের পাশেই ছিল। কলবেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই 'ক্যাচ' করে খুলে গেল দরজা। সালাম দিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দারোয়ান।

'হাজি সাহেব আছেন?' মির্জা প্রশ্ন করলেন।

'জি স্যার। আসেন।'

ভেতরে ঢুকে সোজা ড্রয়িংরুমে চলে এলেন মির্জা। সোফায় বসে গা এলিয়ে দিলেন। সারা শরীর ঘামে ভেজা। বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে আরও আরাম করে তিনি সোফায় বসলেন। ঘুম ঘুম লাগছে। আরামে বুজে আসছে চোখ দুটো।

'আস্‌সালমু আলাইকুম।'

তন্দ্রাবস্থা থেকে সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মির্জা। হাজি মোতালেব হাসতে হাসতে হাত দুটো এগিয়ে দিলেন, 'কী ব্যাপার মির্জা সাহেব, হঠাৎ?'

'এই এমনি। চা খেতে এলাম।'

'অবশ্যই খাবেন। এ তো আমার সৌভাগ্য। বসুন। কিন্তু...', মির্জার চোখে দৃষ্টি রাখলেন হাজি মোতালেব, 'অন্য কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে।'

'সুশীল ব্যানার্জির আপনার এখানে আসার কথা।' সোফায় বসতে বসতে বললেন মির্জা।

দু চোখের ভ্রূ কুঁচকে গেল হাজি মোতালেবের, 'কেন?' একটু থেমে তারপর বললেন, 'এই লোকটাকে আমি একদম পছন্দ করি না। আপনি

জানেন স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান থাকার সময় তিনি অনেক টাকা এসপার-ওসপার করেছেন। মুখেই শুধু বড় বড় কথা, অন্তরে হাজারো কলুষতা।'

'আজ ওসব প্রসঙ্গ থাক হাজি সাহেব।'

'না মির্জা সাহেব, সুশীল ব্যানার্জির ওপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ার মতো অনেক কারণ আছে। ওনার ছোট ভাই মারা যাওয়ার পর বিধবা স্ত্রী আর ছোট ছেলেকে প্রায় জোর করেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সবই সম্পত্তির লোভে। ইদানীং শুনছি নকল ওষুধের ব্যবসাও নাকি ধরেছেন...।'

কলবেলের শব্দ হলো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন হাজি মোতালেব। প্রফেসর জহির আর সুশীল ব্যানার্জি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। পেছনে কবীর, সাদী ও শিহাবও আছে। সবার সঙ্গে হাজি মোতালেব করমর্দন করে ইশারায় সোফায় বসতে বললেন।

সবাই বসল। প্রফেসর জহির চশমাটা খুলে পাশে টেবিলের ওপর রাখলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে মির্জার দিকে তাকালেন, 'হাজি সাহেবকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন তো?'

'না, এখনো জানানো হয়নি।' প্রফেসরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দিলেন মির্জা।

'তাহলে আমিই বলি', একে একে শিহাব, সাদী ও কবীরের ওপর চোখ বুলিয়ে হাজি মোতালেবের দিকে ফিরলেন প্রফেসর, 'ওদের সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম, একটা অবৈধ বাচ্চা কে যেন ফেলে রেখে এসেছিল বড় রাস্তার পাশে ডাস্টবিনের কাছে। খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। গতকাল মাঝরাতে একজনকে ওদিকে পোঁটলা হাতে নিয়ে যেতে দেখেছি।' বলতে বলতে প্রফেসরের দু চোখ সুশীল ব্যানার্জি ও মির্জা হয়ে হাজি মোতালেবের মুখে এসে স্থির হলো।

হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠল হাজি মোতালেবের শরীর। শিরদাঁড়া সোজা করে তিনি সামান্য এগিয়ে এলেন, 'আমিও সে রাতে একজনকে দেখেছিলাম। ঘোমটা পরা ছিল। আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে মেয়েমানুষ বলে মনে হয়েছে।' কথাটা বলে হাজি সাহেব সরাসরি সুশীল ব্যানার্জির দিকে তাকালেন।

ব্যানার্জি কিছু বলার আগেই ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে শিহাব বলল, 'আংকেল, আমরা আজই এর একটা ফয়সালা করতে চাই। এ রকম ঘটনা

এলাকার সুনাম ক্ষুণ্ন করে। তা ছাড়া...'

শিহাবকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মির্জা উঠে দাঁড়ান, 'সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটায় খুব ঝামেলা হবে।' তারপর শিহাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা বরং আজ যাও। আমরা আলোচনা করে দেখি কীভাবে ব্যাপারটা সমাধান করা যায়। তারপর তোমাদের জানাব কী করতে হবে, ঠিক আছে?'

শিহাব, সাদী ও কবীর একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ওরা চলে যেতেই হাজি মোতালেবের দিকে তাকালেন মির্জা। তারপর সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ব্যাপারটা আসলেই খুব ঝামেলার বলে মনে হচ্ছে। আজ বরং থাক। অন্য কোনো দিন আলোচনা করা যাবে।'

সুশীল ব্যনার্জি সঙ্গে সঙ্গে সায় জানালেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মির্জা সাহেব, আজ থাক।'

'আমারও একই মত। বিষয়টা খুব স্পর্শকাতর। সময় নিয়ে বসা উচিত।' প্রফেসর জহির উঠে দাঁড়ালেন।

মনোযোগ দিয়ে সবার মন্তব্য শুনলেন হাজি মোতালেব। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'ঠিক আছে। আপনারা সবাই যখন বলছেন, তাহলে আজ থাক।'

হাজি মোতালেবের বাসা থেকে সবাই বের হয়ে এলেন। গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন সুশীল ব্যানার্জি। প্রফেসর জহিরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চোখ ফেরালেন মির্জার দিকে। মির্জা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের রাস্তার দিকে, ব্যানার্জির দৃষ্টি তাকে আকৃষ্ট করতে পারল না। যার যার বাসার দিকে চলে গেলেন প্রফেসর ও ব্যানার্জি।

নিজের বাসার দিকে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ালেন মির্জা। সোজা এগিয়ে গেলেন ডাস্টবিনটার কাছে। গভীর দৃষ্টিতে ডাস্টবিনটার আশপাশে তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। কিছুক্ষণ পর আনমনে মাথাটা সামান্য দুলিয়ে বাসার পথে পা বাড়ালেন।

৩

'পলির এখন অবস্থা কেমন, সেতারা?' গম্ভীর মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মির্জা।

'অল্প অল্প রক্ত ঝরছে এখনো।' সেতারা বেগম নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

'ওর এত বড় একটা সর্বনাশ হলো কীভাবে?'

'সেটা আমি কী জানি?' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন সেতারা বেগম।

'তুমি কিছু বলেছ?' ঠান্ডা গলায় জানতে চাইলেন মির্জা।

'নাহ। এর মধ্যে বলাবলির কী আছে?'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কী? পাঁচ-ছয় বছর আগেও বাসার প্রতিটি কাজের মেয়ের ক্ষেত্রে যা করতাম, তোমার মেয়ের ক্ষেত্রেও তা-ই করেছি।'

'মানে?'

''মানে অ্যাবরশন করে 'ওটা'কে ফেলে দিয়ে এসেছি ডাস্টবিনে।''

'তুমি মা। তোমার সবকিছু জানা উচিত।'

'হ্যাঁ। শুধু মা হিসেবেই নয়, স্ত্রী হিসেবেও আমার অনেক কিছু জানা উচিত। জানা উচিত প্রতিটি কাজের মেয়ের পেটে কীভাবে বাচ্চা আসত, সেটাও।' কথাটা বলেই শাড়ির আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন সেতারা বেগম। দৌড়ে চলে যান পাশের রুমে।

স্ত্রীর কথা শুনে ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলেন কামরান মির্জা। চোখ দুটো বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখবন্ধ অবস্থায়ই তিনি দেখতে পেলেন, শিহাব, সাদী ও কবীর তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। সে হাসিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে রহস্যভেদের চিহ্ন আর ঘৃণার বিচ্ছুরণ। আরও দেখতে পেলেন, সুশীল ব্যানার্জি, প্রফেসর জহির, হাজি মোতালেব এবং সকালে ডাস্টবিনের কাছে দেখা রাস্তার ঝাড়ুদার সেই মধ্যবয়সী মহিলাকে। সবাই তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হো হো করে হাসছে। সম্মিলিত হাসির শব্দও যেন তিনি শুনতে পেলেন।

ভয় পেয়ে চোখ খুলতে চাইলেন মির্জা। কিন্তু পারলেন না। কেউ যেন সুপার গ্লু দিয়ে তার দু চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। চিৎকার করে স্ত্রীকে ডাকতে গেলেন। ঠিক তখনই দেখতে

পেলেন শিশুটিকে। ডাস্টবিনের পাশে পড়ে থাকা, কুকুরের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া, দু চোখবিহীন সেই শিশুটি। মির্জা দেখতে পেলেন আশ্চর্য মায়াবী দুটি চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে শিশুটি। সেই হাসির রহস্য কামরান মির্জা কিছুতেই বুঝতে পারেন না, বোঝার কথাও নয়।

চিহ্নস্মৃতি

ব্যাপারটা আজ ঘটবে, আমি নিশ্চিত জানি ঘটবে। প্রতিবছর যেহেতু ঘটে আসছে, সুতরাং আজও ঘটবে। আমি অপার হয়ে সেটা ঘটার অপেক্ষায় বসে আছি, ঘুম ভাঙার পর থেকেই বসে আছি।

রিনি খুব আন্তরিক গলায় একদিন বলেছিল, 'তোমার কাছে আমার একটা জিনিস চাওয়ার আছে।'

বেশ চমকে উঠলাম আমি। তবে আমার সেই চমকানোটা রিনি টের পেল না। বুকের ভেতরের কাঁপুনিটা বুকের ভেতরেরই ঘুরপাক খেয়েছে, বাইরে বের হতে পারেনি। সমস্ত শঙ্কা, আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা চেপে রেখে আমি খুব স্বাভাবিক স্বরে বললাম, 'বলো।'

মাথাটা নিচু করে ছিল রিনি। আলতো করে সেটা তুলে আমার দিকে তাকায়। আমি আবার চমকে উঠি। আগের মতোই ভেতরে ভেতরে। চার বছরের প্রণয় জীবনে ও কখনো আমার দিকে এভাবে তাকায়নি। সম্মোহিতের মতো আমিও তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। দুজনের মৌন চাহনিতে কেটে যায় অনেকক্ষণ। তারপর রিনি তাকায় জানালায় বসা দোয়েলের দিকে, আর আমি তাকাই দোয়েল ছাড়িয়ে আকাশের দিকে।

লেজ নাড়িয়ে শিস বাজিয়ে দোয়েলটা চলে যায় এক সময়। রিনি চোখ ফেরায়, আমি ফেরাই না। স্থির আকাশের দিকে স্থির হয়েই তাকিয়ে থাকি।

'তোমার মনে আছে, আমাদের দেখা হওয়ার প্রথম দিনে তুমি আমাকে

প্রথম কোন কথাটি বলেছিলে?' রিনি প্রশ্নবোধক চাহনিতে আমার দিকে তাকায়।

'আপনার ব্যক্তিত্ব মুগ্ধতা বাড়ায়।'

'তারপর?'

'তারপরেরটুকুও বলতে হবে?'

'বলো না।' চোখের মণি দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে রিনির।

মুগ্ধ হয়ে আমি রিনির দিকে তাকাই। যতটুকু সুন্দর হলে একটা জিনিসকে কখনো কখনো অসহনীয় মনে, রিনির চোখ দুটো হচ্ছে তাই, তাকিয়ে থাকা যায় না বেশীক্ষণ।

কিছু বলি না আমি। গভীর অথচ নির্মল চোখে আমার চোখের দিকে তাকায় রিনি, 'বলো।' খুব বেশী দূরে দাঁড়িয়ে নেই ও, কিন্তু দূরাগত শোনায় ওর গলাটা। সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে পরে আমার অস্বিত্বে।

তবু আমি কিছু বলি না। ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি রিনির, 'এতদিন পরও লজ্জা পাচ্ছো তুমি!'

'না, ঠিক লজ্জা না।' ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলাই আমি, 'প্রথম আবেগে যে কথাটা বলা হয়, পরে কি আর সেটা সেভাবে বলা যায়?'

বাঁকানো ভ্রু দুটো আরো একটু বাঁকা করে রিনি বলে, 'তোমার আবেগ শেষ হয়ে গেছে প্রসূণ!'

'আবেগ কখনো শেষ হয়? সেটা বদলায়—সময়ে, পরিবেশে, অবস্থানে।' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলাম আমি। দ্বিধাযুক্ত সে কণ্ঠে আমি বলি, 'আমরা কী সবাই একটু আধটু বদলাই না?'

রিনি ছোট্ট করে বলে, 'হ্যাঁ, বদলাই। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যদি আমার দেখা না হতো?'

প্রসঙ্গ পাল্টালো রিনি, টের পেলাম আমি, কিন্তু বুঝতে দিলাম না ওকে। হেসে হেসে বলি, 'আমার সাগর দেখা হতো না!'

'যদি পরিচয় না হতো?'

'অন্ধ হয়ে থাকতাম!'

'কথা না হতো?'

'সুরের মাধুর্য জানতাম না!'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল রিনি। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ও, লুকাতে

চেষ্টা করছে তা, কিন্তু পারছে না। আমাদের দুজনের মাঝখানে পার্থক্য মাত্র দেড় ফুট, অথচ কত দূরের মনে হচ্ছে ওকে। হাত বাড়ালেই যাকে স্পর্শ করা যায়, চোখ মেললেই যার ভেতরটা দেখা যায়, মাথা বাড়ালেই যার কাঁধে আসন পাওয়া যায়, তাকে আজ খুব দূরের মনে হচ্ছে।

'প্রসুণ, চা খাব।'

'কিচেনে যেতে হবে।'

'তোমার বাসায় এসে এতদিন আমিই বানিয়ে খাইয়েছি, আজ তুমি বানিয়ে খাওয়াবে।'

'আমার চা কি তোমার পছন্দ হবে?'

'তা না হোক, তুমি তো পছন্দের।' রিনি হাসতে থাকে। শব্দ করে হাসে ও, নূপুরের মতো টুং টুং শব্দ হয় সেই হাসিতে, 'থাক, চা-টা আমিই বানাই। তবে একটা শর্ত!'

'বলো?'

'চা বানানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এর অবশ্য একটা কারণ আছে।'

'কারণ?

'তোমাকে আজ চা বানানো শেখাব আমি।' উচ্ছ্বসিত হয় রিনি, 'অনেকদিন ধরে একটা কথা ভেবেছি আমি।'

'কী?'

'তোমার ঘরটা আমি গুছিয়ে দেব।' রিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'এবং আজই দেব। তবে একটা কথা-আজ আমি তোমাকে যেভাবে ঘরটা গুছিয়ে দেব, ঘরটা সেভাবে রাখার চেষ্টা করবে অনেকদিন, যতদিন সম্ভব, যতদিন রাখা যায়। পারবে না?'

বুকের ভেতর ধুক করে ওঠে, রিনি নয়, যেন অন্য কেউ বলল কথাগুলো-অচেনা, অপরিচিত, অস্পষ্ট। বোকার মতো আমি চেয়ে রইলাম রিনির দিকে। রিনি আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে আমার সামনে থেকে, মিলিয়ে যাচ্ছে দূর আকাশে, ও হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে-স্বপ্নের মতো, দুরন্ত ঘুর্ণির বাতাসের মতো।

'আচ্ছা, কোন ঘর থেকে শুরু করব, বলো তো?'

সম্বিৎ ফিরে আসে আমার। রিনিকে এখন সত্যি সত্যি অচেনা মনে হয়

আমার। কেমন ঘোলাটে, ঠুনকো, মড়মড়ে, যেন ছোঁয়া লাগলেই ভেঙে যাবে।

'ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন, কথা বলো?'

'তোমার ইচ্ছে।'

'আমি তাহলে ড্রইং রুম থেকে শুরু করি?'

'করো।'

রিনি আমার ঘর গোছাচ্ছে। আমি অপলক চোখে চেয়ে আছি ওর দিকে-শান্ত, কোমল, নিরুদ্বিগ্ন মুখ। আর ঠিক তখনই, বুকের ভেতর রিনিরিনি করে বেজে ওঠে একটা সুর, একটা ছন্দ এসে ঢেউ খেলে যায় গলার কাছ দিয়ে। চোখের পাপড়িগুলো নড়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে পেটের উপরিভাগটা, সমস্ত অস্তিত্বে নির্বিচ্ছিন্ন ঠাণ্ডা এক সুখ এসে আছড়ে পরে। হঠাৎ করে রিনি আমার ঠিক সামনে এসে আহলাদি স্বরে বলে, 'একটা কথা বলি তোমাকে?'

'বলো।'

'কথাটা তোমাকে মনে রাখতে হবে কিন্তু।'

'না রাখলে?'

'বলব না।'

জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় রিনি। গ্রিলে হাত রেখে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে বাইরে। কিছু বলে না। আমি উঠে গিয়ে আলতো করে ওর পিঠে হাত রাখি। ও ওর একটা হাত এনে আমার হাতে রাখে। তার সেই হাতটা টেনে নিয়ে ওর গালে ছোঁয়ায়। আমি জানি, রিনি এখন কাঁদবে। মন খারাপ থাকলেই ও অনেকবার আমার বাসায় জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমি ওর পিঠে হাত রেখেছি, আমার সেই হাতে হাত রেখে সেটা টেনে নিয়ে গাল স্পর্শ করিয়েছে, তারপর নীরবে কেঁদেছে। কিন্তু আমি কখনো ওকে এ মন খারাপ, এ কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করিনি, রিনিও আমাকে বলেনি।

রিনিকে আজও আমি জিজ্ঞেস করলাম না। ও কাঁদছে, আর আমি পিঠে হাত রেখে সান্তনার পরশ দিচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ দুটো মুছে রিনি আমাকে নিয়ে আমার বিছানায় বসায়। তারপর মৃদু হেসে বলে, 'তুমি আমার দিকে একটু ভালো করে তাকাও তো দেখি। কত দিন তোমার মুখটা ভালো করে দেখি না।'

চোখ তুলে রিনির দিকে তাকালাম আমি। ও প্রথমে আমার ডান গালে হাত রাখল। হাতটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠোঁটে, চোখে, চোখের পাপড়িতে, কপালে। আমি চোখ বুজে ফেলি মুগ্ধতায়। ফুল ফুটে ওঠে, পাখি গান গায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় আনন্দে, কোনো এক ঝরনা থেকে জলফোয়ারা উথলে ওঠে গগনে।

তারপর?

তারপর হঠাৎ, হঠাৎ ও মুখ রাখে আমার গলায়। প্রথমে ঠোঁট, তারপর দাঁতগুলো বসে যায় আস্তে আস্তে। তীব্র একটা ব্যথা এসে ছুঁয়ে যায় আশপাশে, কিন্তু আমি নিস্পন্দ নিথর, যেন ওর একটা অনুভবও হারিয়ে না যায়, ওর প্রগাঢ় অনুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে, নিটোল হয়ে যায় প্রতিটি মুহূর্ত! বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হয়ে, নদীর মতো সমর্পণতা নিয়ে আমি রইলাম নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পর রিনি মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকায়। কিছু বলে না, কেবল ছাঁয়ার মতো হেঁটে যায় দরজার দিকে, দরজাটা খুলে ফেলে, দরজার বাইরে পা রেখে মিলিয়ে যায় হঠাৎ আসা মিষ্টি ফুলের গন্ধের মতো!

WWW.BANGLAPDF.COM

রিনি এখন অন্যের বাহুতে ঘুমায়, অন্যের গলায় ঠোঁট রাখে, অন্যের চুলে বিলি কেটে যাপিত জীবনের গল্প করে। আমার অক্ষমতা, আমার অপারগতা, আমার মৌনমুখরতায় সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল ওর, তারপর পারিপার্শ্বিক চাপ, ও এখন তাই পরস্ত্রী। আমি বুঝতে পারিনি সেদিনই ছিল আমার আর ওর অবিশ্রান্ত কথোপকথনের শেষ প্রহর, অন্তহীন স্পর্শ, অনুভূতির শেষ বিনিময়।

আমার সব নিয়ে গিয়ে নিঃস্ব করেও একটা জিনিস দিয়ে গেছে ও আমাকে। প্রতিবছর এই দিনটাতে আমার গলার নিচটা লাল হয়ে যায়, দাগ হয়ে যায়, অবিকল সেই সেদিনের দাগ। সেই দাগটা নিয়ে আমি বসে থাকি বৃষ্টি প্রতিক্ষিত তিতিরের মতো-হায়, যদি ও আরেকটা বার আসত, শুধু একবার। দু চোখ বেয়ে বিষাদ নামে আমার, গাঢ় বিষাদ। ও আসে না!

ধূপকাঠি

খুব বিনীতভাবে মহিলাটি বললেন, 'মারে, তুমি কী আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে?'

জরুরী একটা কাজ করছিলেন কানিজ ম্যাডাম। বা হাত এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলো কী বোর্ডে থাকলেও কম্পিউটারের মনিটর থেকে চোখ দুটো সরিয়ে আনলেন তিনি। তার টেবিলের ওপাশে দুজন মহিলা আর একটি বিশ-বাইশ বছর বয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষাকৃত বয়সী মহিলাটির সারামুখ ঘেমে গেছে, হাপাচ্ছেনও তিনি।

কানিজ ম্যাডাম ফিরে তাকাতে যতটা সম্ভব শ্বাসটা চেপে রাখার চেষ্টা করলেন মহিলাটি, কিন্তু পারলেন না। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি আবার বলেন, 'দেখতে পাচ্ছি তুমি ব্যস্ত। খুব বেশী সময় নেব না তোমার, কথাটা শেষ করেই আমরা বাইরের সিটে গিয়ে বসব।'

বেশ অবাক হলেন কানিজ ম্যাডাম। অনেকেই তাকে তুমি বলে সম্বোধন করে, কিন্তু অপরিচিত কেউ কখনো তা করেনি। একজন মেয়ের যতটুকু বয়স হলে মানুষ তাকে বড় বলে, অন্তত সেই বড় হয়ে যাওয়ার পর কেউ করেনি। অবাকের সঙ্গে সঙ্গে একটু ভালোও লাগল সেটা শুনে। আপনি আপনি শোনার যান্ত্রিকতার মাঝে অপরিচিত কারো মুখে তুমি শোনা, তাও সাধারণভাবে কোনো বলা না, পরম আন্তরিকতায় বলা।

সামনের চেয়ারগুলো দেখিয়ে ম্যাডাম বললেন, 'আগে বসুন। ঘেমে

গেছেন আপনি, সম্ভবত খুব টেনশন হচ্ছে আপনার।'

'হ্যাঁ মা, খুব টেনশনে আছি।' চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন মহিলাটি।

খুব মিষ্টি করে হাসলেন কানিজ ম্যাডাম। সারাজীবন এই হাসি দিয়েই তিনি তার সব সমস্যার সমাধান করেছেন। এটা তার এখন বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের পরীক্ষা পেলেন তিনি এখনো। ভদ্র মহিলা বেশ আশ্বস্থতার সঙ্গে চেয়ারে বসলেন, ইশারায় সঙ্গের দুজনকেও বসতে বললেন।

কানিজ ম্যাডাম বললেন, 'আপনাকে এক গ্লাস পানি দিতে বলি?'

'খুব ভালো হয়, যা গরম পরেছে।'

কলিংবেল টেপার পর পানি আসতেই পানি খেলেন সবাই। ম্যাডাম আবার পাশের ডেস্ক থেকে মহিলার দিকে ফিরলেন, 'এবার আপনার কথা বলুন।'

কথা বলার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে আসছিলেন মহিলাটি। কিন্তু তার আগেই হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে আগের জায়গায় বসতে বললেন ম্যাডাম। তিনি আগের জায়গায় বসে মুখটা হাসিময় করে বললেন, 'আপনার কাছে এসে বলতে পারলে একটু আরাম পেতাম।'

মহিলা তুমি থেকে আপনিতে চলে এসেছেন। ম্যাডাম সেটা খেয়াল করে হাসলেন। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন, 'আমার কাছে এসে কথাটা বলতে পারলে আপনি আরাম পাবেন?'

'হ্যাঁ মা।'

'আসুন।'

চেয়ার থেকে উঠে আসলেন মহিলাটি। আঁচলটা টেনে নিয়ে রুমের দরজার দিকে একবার তাকালেন। তারপর পেছনের সিটে বসা আরেক মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, 'ও হচ্ছে আমার ছোট বোন, আর ওর পাশে হচ্ছে ওর মেয়ে। মেয়েটাকে আজ দেখতে আসবে।' মহিলাটি আর কিছু বলেন না, থেমে যান হঠাৎ করে।

'বলুন।' কানিজ ম্যাডাম শান্ত স্বরে বলেন।

'বলতে একটু লজ্জাই লাগছে।' মহিলাটি সামান্য থেমে বলেন, 'এ পর্যন্ত সাত-আট ফ্যামিলি দেখে গেছে ওকে, কিন্তু কেউই তেমন পছন্দ করেনি। আজও এক ফ্যামিলি দেখতে আসবে। আপনার পারলারের তো

অনেক সুনাম, তাই যদি একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেন ওকে, তাহলে ভালো কিছু হয়ে যেতে পারে ওর।' টেবিলের ওপর মেলে রাখা ম্যাডামের হাত দুটো দুহাত দিয়ে ঝট করে চেপে ধরে মহিলাটি বলেন, 'টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবে না, যা লাগে সব দেব আমি। প্লিজ, একটু দেখুন না।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন কানিজ ম্যাডাম, সোজা হয়ে বসেন তিনি। তার এগার বছরের এই পারলার ব্যবসায় অনেক কিছুই দেখেছেন তিনি, কিন্তু আজকের মতো কখনো দেখেননি। মহিলার দু চোখ ভিজে গেছে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন তিনি বারবার।

২.

নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল মিতুলা। আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল তাই একটু সময় নিয়েই। এ সময় পাশের ডেস্ক থেকে লুবনা এসে বলে, 'সাজলে যে তোকে কত ভালো লাগে, জানিস?'

মিতুলা আয়নার ভেতর দিয়ে পাশে দাঁড়ানো লুবনার দিকে তাকায়। নিজের চেহারাটা আরো একটু ভালো করে দেখে বলে, 'না, জানি না।'

'জানিস ঠিকই, কিন্তু বলবি না।'

'বললে কী হবে?'

'বললে কী হবে সেটা পরের কথা, মাঝে মাঝে এভাবে সাজলে কী হয়? আমাদের এ পারলারে তুই হচ্ছিস সেরা, সাজানোতে সবচেয়ে এক্সপার্ট তুই, তোর এত সুনাম। তুই নিজেই তো নিজেকে সাজাতে পারিস, অন্যের দরকার হয় না তোর। অথচ তুই সাজতেই চাস না।'

'সাজলে কী হবে?'

ঝটকা দিয়ে মিতুলার একটা হাত টেনে ধরে লুবনা, 'এই ছেমরি, এত কী হবে কী হবে করছিস কেন তুই?'

মিতুলা ঘুরে দাঁড়িয়ে লুবনার মুখের দিকে তাকায়। আলতো করে ওর কাঁধে হাতও রাখে একটা। তারপর মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'সারা দিন এত মানুষকে সাজাতে হয় আমাদের। কত মানুষকে কত রকমভাবে সাজাই আমরা। তারপর কী আবার নিজেদের সাজাতে ইচ্ছে করে? বল করে?'

'তা করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে তো সাজা যায়।

'এই তো সাজলাম।'

'এটা মাঝে মাঝে হলো! তুই তো বোধহয় এক-দেড় বছর পরে সাজলি।' লুবনা টেবিল থেকে একটা টিস্যু পেপার নিয়ে মিতুলার ঠোঁটের কোনাটা ঠিক করে দিতে দিতে বলে, 'আচ্ছা, তুই তো একটু পর চলে যাবি।'

'হ্যাঁ, আজকের মতো ছুটি নিয়েছি।'

'সন্ধ্যার আগেই বাসায় চলে যাচ্ছিস, কোনো প্রোগাম-টোগ্রাম আছে নাকি তোর?' লুবনা আগ্রহ নিয়ে তাকায় মিতুলার দিকে।

'প্রোগাম-টোগ্রাম কী আর।' মিতুলা আবার আয়নার দিকে তাকায়, 'সন্ধ্যায় তো বাসায় থাকতে পারি না একদিনও। ছুটির দিনটাতেও এখানে ওখানে বেড়াতেই কেটে যায়। আজকের সন্ধ্যাটা ভাবছি বাসাতেই কাটাব।'

'ও ভালো কথা, তোর একটা কার্ড এসেছে, দেখেছিস?'

মিতুলা আবার ঘুরে তাকিয়ে বলে, 'কীসের কার্ড?'

'সম্ভবত বিয়ের।'

'বিয়ের!' মিতুলা কিছুটা অবাক হয়ে বলে, 'কই, দেখি দেখি।'

'তোর ডেস্কের ড্রয়ারেই তো আছে।'

একটু এগিয়ে গিয়ে বা পাশের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করে মিতুলা। কপাল কুঁচকে খামটা খুলে একটা কার্ড বের করে সেখান থেকে, সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠিও। সেটা পড়ে কার্ডটা এক পলক তাকিয়ে ম্লান হেসে বলে, 'ওই যে, সেদিনের ওই মেয়েটা লিখেছে।'

'কোন মেয়েটা?'

'ওই যে কালো ধরনের একটা মেয়ে এসেছিল না সেদিন? সাজিয়ে দেওয়ার পর যে মেয়েটা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল। ওই মেয়েটার বিয়ে।' মিতুল খামের ভেতর কার্ডটা আবার ভরতে ভরতে বলে, 'আজ যাই, সন্ধ্যার আগেই বাসায় পৌঁছতে হবে।'

বাসায় যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় মিতুলা। কানিজ ম্যাডাম আসছেন মুখটা হাসি হাসি করে। মিতুলার সামনে এসে মুখের হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'একটা সমস্যা হয়ে গেল যে মিতুলা।'

মিতুলা কিছুটা সংকুচিত হয়ে বলে, 'কী সমস্যা ম্যাডাম?'

'তুমি তো সাধারণত ছুটি নাও না, আজ কী কারণে ছুটি নিলে তাও জানি না। তোমাকে কী একটা রিকোয়েষ্ট করতে পারি?' কানিজ ম্যাডাম আগের মতোই হাসতে থাকেন।

'ম্যাডাম বলুন।'

'একটা মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে তোমাকে। ওকে আজ দেখতে আসবে। স্পেশাল একটা সাজ দরকার মেয়েটির। তোমাকে ছাড়া যে এ কাজটা করার আর কাউকে দেখছি না।' কানিজ ম্যাডাম একটু ইতস্তত করে বলেন, 'ছুটিটা কাল নিলে হয় কী তোমার?'

'কোনো সমস্যা নেই ম্যাডাম। আপনি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন। এখনই সাজিয়ে দিচ্ছি তাকে।' বাসায় যাওয়ার জন্য হাতে নেওয়া ব্যাগটা আবার ডেস্কের ভেতর রেখে দেয় মিতুলা।

'থ্যাংকু।' কানিজ ম্যাডাম তার চিরাচরিত হাসিটা আবার প্রয়োগ করেন এবং আবারও বলেন, 'থ্যাংকু, মিতুলা।'

৩.

খুব শরমিন্দা মুখে মেক-আপ রুমে ঢুকল মেয়েটি, সঙ্গে তার বড় খালাও। সাধারণত যাকে সাজানো হয় কেবল সেই মেক-আপ রুমে ঢুকতে পারে, আর কেউ না। কিন্তু বিশেষ অনুরোধে কানিজ ম্যাডাম বড় খালাকে অ্যালাউ করেছেন আজ এবং ব্যাপারটা ইন্টারকমের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছেন মিতুলাকে।

মিতুলা মিষ্টি হেসে আন্তরিকভাবে মেয়েটির একটা হাত ধরে নির্দিষ্ট আসনে বসাল। বড় খালাও এগিয়ে এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। মিতুলা তাঁর দিকে তাকিয়ে আগের মতো হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আপনি ওই জায়গাতে বসুন।' বড় খালাকে পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল মিতুলা।

বড় খালা কিছুটা অনাগ্রহ নিয়ে মিতুলার দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটাতে বসলেন। ব্যাপারটা খেয়াল করল মিতুলা এবং মুচকি হাসতে হাসতে মেয়েটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে আছে মেয়েটা । থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে মিতুলা বলল, 'আপনার নামটা যেন কী?'

'নিয়ন্তি।' মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলে।

'খুব সুন্দর নাম।' মিতুলার নিয়ন্তির মুখটা আরো একটু উঁচু করে ধরে বলে, 'আপনি শাই ফিল করছেন কেন নিয়ন্তি, রিল্যাক্স হয়ে বসুন এবং আমি যা যা করতে বলি তাই করুন। ঠিক আছে?'

কিছু বলে না নিয়ন্তি, কেবল মাথা উঁচু-নিচু করে। কিন্তু পাশ থেকে বড় খালা বলেন, 'মা, তুমি কিন্তু ওকে তোমার মতো করে সাজিয়ে দেবে।'

বড় খালার দিকে তাকিয়ে মিতুলা বলে, 'আমার মতো মানে?'

'তুমি যেভাবে সেজে আছো, ঠিক সেভাবে।'

'আপনার পছন্দ হয়েছে সাজানোটা?'

'খুব।' বড় খালা একটু উৎসাহী হয়ে বলেন, 'তোমার সাজ দেখে মনে হচ্ছে তোমার আজ বিয়ে অথবা তোমাকে কেউ আজ দেখতে আসবে।'

'তাই!'

'যা সুন্দর করে সেজেছ তুমি!' বড় খালা চেয়ার থেকে উঠে এসে নিয়ন্তির পাশে এসে দাঁড়ান। মিতুলা আড়চোখে একবার সেটা দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। নীরব সম্মতি পেয়ে খালা আরো একটু পাশ ঘেষে বলেন, 'তোমার মতোই চুলগুলো টেনে বেধে দিও।'

নিয়ন্তি হেসে বলে, 'ঠিক আছে, দেব।'

'ভ্রু দুটো কী একটু চিকন করে দেবে?'

'হ্যাঁ, দিতে হবে।'

বড় খালা আয়নার ভেতর দিয়ে নিয়ন্তিকে দেখেন, খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। বেশ কিছুক্ষণ পর কিছুটা অসন্তুষ্টি নিয়ে মিতুলাকে বলেন, 'মারে, ওর গালের রঙটা কি একটু বেশী হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, রঙটা একটু বেশীই দেখা যাচ্ছে, এটা ঠিক করতে হবে।'

বড় খালা মিতুলার গায়ের একটা হাত রাখতেই চমকে উঠল সে, অনেকদিন পর এরকম একটা ছোঁয়া, একেবারে মায়ের হাতের ছোঁয়া। মিতুলা নিয়ন্তির ঠোঁট থেকে হাত সরিয়ে বড় খালার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিছু বলবেন আপনি?'

'হ্যাঁ মা।'

'বলুন।'

বড় খালার চোখ দুটো ভিজে ওঠে হঠাৎ, টল টল করতে থাকে সে দুটো। চোখের ভেতরের সেই জিনিসগুলো বাড়তে থাকে, এক সময় সেগুলো

ফোটায় রূপান্তরিত হয়ে গালে গড়িয়ে পড়ার আগেই আঁচল চেপে ধরেন সেখানে। তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বড় খালা বলেন, 'তোমার সজানোর উপরই সবকিছু নির্ভর করছে আজ। আজকে যদি সব কিছু ভালোই ভালোই হয়, আমি তোমার জন্য সারাজীবন দোয়া করব। তুমি অনেক সুখী হবে মা, অনেক।'

মিতুলার সুক্ষ্ম যে মন খারাপ ছিল, এই একটু আগেও, কেমন যেন মিইয়ে যায় সেটা। নিয়ন্তির দিকে তাকিয়ে চেহারাটা আবার ভালো করে দেখে নেয় সে। আরো একটু ভালো করে সাজাতে থাকে সে আন্তরিকতা নিয়ে।

পুরো দুই ঘণ্টা পর মিতুলা একটু হেসে নিয়ন্তির চেহারাটা বড় খালার দিকে ঘুরিয়ে বলে, 'দেখুন তো কেমন হয়েছে?'

আবার কেঁদে ফেলেন খালা, কিন্তু বলেন না কিছু। মিতুলাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় একটা হাত বুলাতে থাকেন তিনি। তারপর আলতো করে কপাল, চোখ. নাক, থুতনি ছুঁয়ে দিয়ে চলে যান তিনি। পেছনে পেছনে নিয়ন্তিও।

মুগ্ধতায় ছেয়ে যায় মিতুলার মন, প্রজাপতির মতো সুন্দর লাগছে নিয়ন্তিকে-রঙীন, উচ্ছল, ফুরফুরে!

৪.

রাতের শহরটাকে অদ্ভূত লাগে মিতুলার, ফাঁকা ফাঁকা। সকালে ব্যস্ত হয়ে সবাই ছুটে আসে এখানে, বিকেলের পর থেকেই আবার সবাই এটা ছেড়ে যেতে চায়, ফিরে চলে যায় নিজ আবাসে। এখানে আসার যেমন ব্যস্ততা দেখা যায় সকালে, ফিরে যাওয়ার সময়ও ঠিক একই ব্যস্ততা। অদ্ভূত! মাঝখানে কয়েক ঘণ্টার অন্য জীবন-কম বেশী সবাই দাস; সে নিজের জন্যে, সে জীবনের তাগিদে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে নেমে রিকশায় চড়লেই অনেক ভাবনা আসে মনে, কোনো কোনো দিন হিসেব করতেও বসে মিতুলা। কেউ কী এসেছিল জীবনে? কী জানি, এসেছিল বোধহয়। একটু পর আবার ভাবে, কী লাভ সেসব মনে রেখে! জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কী কখনো মেলে, না কেউ মেলাতে পারে!

বাসায় পৌঁছতেই মিরা কিছুটা দৌড়ে এসে বলে, 'আপু, তুমি আজ এত দেরী করে এলে যে! তোমার না সন্ধ্যার আগেই আসার কথা।'

মিতুলা হাতের চকচকে চুড়িগুলো খুলে পাশের টেবিলে রাখতে রাখতে বলে, 'আসতে না পারলে কী করব বল?'

'তোমাকে দেখার জন্য ওরা সন্ধ্যার পরপরই এসেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে ওরা। ওদের খুব আগ্রহ ছিল আপু, এবার বোধহয় বিয়েটা হয়েই যেত তোমার।' মিরা খুব কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'মা শুয়ে আছে। বাবা মন খারাপ করে বলছিল, বেশ কয়েকবার তোমাকে দেখে গেছে অনেকে, কিন্তু তেমন কিছু হয়নি, এবার নাকি কিছু একটা হয়ে যেত।'

'আসার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি রে।' কানের দুল দুটো খুলে চুড়ির পাশে রাখে মিতুলা।

'আজকের মতো আগেও তুমি বাসায় আসতে চেয়ে আসোনি। বাবা এটা নিয়েও মন খারাপ করেছে।'

মিতুলা আর কিছু বলে না। বেসিনের কাছে গিয়ে মুখটা ধুতে থাকে সে। কিছুক্ষণ পর মাথাটা উঁচু করে আয়নার দিকে তাকায়। মুখে লাগানো রঙগুলো গলে গলে যাচ্ছে। রঙহীন এই জীবনের মতো এক সময় রঙহীন হয়ে যায় মুখটা। অবাক হয়ে নিজের মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে মিতুলা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে অনুভব করে, মনের ভেতর কোথায় যেন এক টুকরো নীলাভ আলো জ্বলে আছে। পরক্ষণেই মিতুলা আবার অনুভব করে—ওটাই আশা, ওটাই স্বপ্ন। যে আশা, যে স্বপ্ন নিয়েই তার প্রতিদিন।

আয়নার ভেতর নিজেকে হঠাৎ ঘোলাটে দেখে মিতুলা। জলের কোনো রঙ নেই, কিন্তু চোখের জলের আছে। সেই রঙে রঙীন করে দু ফোটা জল থমকে আছে তার দু চোখের কোনায়।

অলৌকিক

লোকটাকে দেখে যতটা না চমকে উঠলাম, তার চেয়ে বেশি অবাক হলাম আমি। দেড় বছর আগে দেখা লোকটার সবকিছু প্রায় একই আছে, শুধু কালো চশমাটি ছাড়া। তার সঙ্গে এবার নিয়ে আমার তিনবার দেখা। অথচ প্রথমবার দেখা হওয়ার সময়ও তার চোখে কোনো চশমা ছিল না, এমনকি তার কপালের বা পাশে এবং বাঁ গালে যে মোটা কালো দাগটা দেখা যাচ্ছে, আমি নিশ্চিত, সেটাও ছিল না।

বেশ ফুরফুরে মন নিয়েই সেদিন বাসায় ফিরছিলাম, অফিস শেষ হওয়ার একটু আগেই। কারওয়ান বাজারের ওভারব্রিজটা পার হয়ে মিষ্টির দোকানের কাছাকাছি আসতেই দেখি কিছুটা বুড়িয়ে যাওয়া একটা লোক দু হাতে দুটো বাজার বোঝাই করা ব্যাগ নিয়ে সামনের বাসস্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। একটু কাত হয়ে হাঁটছেন তিনি। আমি ভালো করে খেয়াল করে দেখি যেদিকে কাত হয়ে গেছেন লোকটা সেদিকের হাতের ব্যাগটা একটু বড়, জিনিসপত্রও একটু বেশি। আমি তাঁর আরো একটু কাছ ঘেঁষতেই টের পেলাম ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি, হাঁপাচ্ছেনও। বাবার মুখটা ভেসে উঠল নিমিষেই, এক মুহূর্তেই। ছোটবেলা দেখতাম, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে ফিরতেন, সঙ্গে থাকত একটা বাজারের ব্যাগ। বাজারে ভরা ব্যাগটা বয়ে আনতে আনতে ঘেমে যেতেন তিনি, হাঁপাতেন তিনি, এমনকি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অস্থিরও হয়ে যেতেন। অথচ মাত্র তিন টাকা রিকশা ভাড়া

বাঁচানোর জন্য তিনি সেই দেড় মাইল দূর থেকে ভারী ব্যাগটা বয়ে আনতেন, যে তিন টাকা দিয়ে লেখাপড়া করা আমাদের পাঁচ ভাই-বোনের দুটো খাতা হতো অথবা একটা কলম হতো কিংবা একটা চিকন নোটবই হতো। বাবার মতো লোকটার আরও কাছ ঘেঁষে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে আমি বললাম, 'আমি কি আপনার একটা ব্যাগ বয়ে দিতে পারি?'

থমকে দাঁড়ালেন লোকটা, দাঁড়ালাম আমিও। ব্যাগ দুটো খুব যত্ন করে ফুটপাতের একপাশে নামিয়ে তিনি আমার দিকে মমতা নিয়ে তাকালেন। মুখটা একটু একটু করে হাসি হাসি হয়ে উঠছে তাঁর, হাসিটা সম্পূর্ণ চেহারায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই তিনি বললেন, 'কী সুন্দর কথা, আমি কি আপনার একটা ব্যাগ বয়ে দিতে পারি!' লোকটা ব্যাগ ছেড়ে আমার ডান হাতের বাহুটা ধরে আন্তরিক গলায় বললেন, 'কত দিন পর এ রকম মন-শান্তি-হওয়া কথা শুনলাম। জানেন, আজকাল ছেলে-মেয়েরা এ রকম কথা বলা প্রায় ভুলেই গেছে।'

লোকটা এখনো একটু একটু করে হাঁপাচ্ছেন। আমি তার ছেড়ে দেওয়া ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াতেই তিনি আমার চেয়ে দ্রুত গতিতে ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালেন। তারপর ব্যাগটা শক্ত করে ধরে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'থ্যাঙ্কস।'

আরো একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে লোকটার দিকে তাকালাম আমি। মেদহীন শরীর, মাথাভর্তি আধাপাকা চুল, টাক পড়ার কোনো রকম আশঙ্কা নেই, ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যাওয়া ঘোলাটে ফুলহাতা সাদা শার্ট, গ্যাবাডিনের প্যান্ট এবং পেছনে বেল্টওয়ালা চামড়ার এক জোড়া স্যান্ডেল পায়ে। লোকটার যে জিনিসটা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম, তা হলো তাঁর চোখ। এমন সুন্দর টানা টানা চোখ যে কোনো পুরুষমানুষের হতে পারে, তা জানা ছিল না আমার, কোনো দিন দেখিওনি।।

ব্যাগ দুটো আবার হাতে নিয়েছেন লোকটা। আমি একটু শব্দ করেই বললাম, 'যদি একটা ব্যাগ দিতেন খুব খুশি হতাম।'

'তার চেয়ে আমি বেশি খুশি হব যদি আমি নিজেই ব্যাগ দুটো বয়ে নিয়ে যাই।' লোকটা ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার প্রমাণ দিলেন, তিনি শব্দ করে হাসতে লাগলেন, প্রাণখোলা হাসি।

'কোথায় যাবেন আপনি?'

লোকটা কিছুটা কৌতুক করে বললেন, 'কেন, বাসায়!'

'তা তো জানি। বাসা কোথায় আপনার?'

'মিরপুরে।'

'মিরপুরে তো আমারও বাসা।'

'কোথায়?'

'রূপনগরে।'

'আমার পল্লবীতে।'

'এত বাজার করেছেন কেন আপনি?'

'এত আর কই, কাঁচা জিনিসপত্র বাদ দিয়ে সারা মাসের বেশ কিছু বাজার সাধারণত আমি এক দিনই করি। কারওয়ান বাজারের পাইকারি বাজার থেকে কিনি তো, একটু সস্তায়ই কেনা যায়।'

'মাছও কি এক মাসেরই কেনেন?'

লোকটা হেসে উঠলেন, 'এক মাসের মাছ! এক দিনের মাছ কিনতেই হিমশিম খাই। তবে আজ একটা ইলিশ মাছ কিনেছি। ইলিশ মাছের মৌসুম শুরু হয়েছে সেই কবে, আজই প্রথম একটা ইলিশ কিনলাম। সম্ভবত এখনো বিয়েশাদি করেননি আপনি, করলে বুঝতেন সংসার করা কত মজার।'

'আপনার অফিস কি কারওয়ান বাজারেই?'

'হ্যাঁ, টিকে ভবনে। আপনার?'

'সিএ ভবনে।'

'ও, তাহলে তো কাছাকাছিই। আসুন না একবার, চা খেয়ে যাবেন।'

মানিব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'আপনিও আসুন না।' হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'চা তো খাওয়াবই, সঙ্গে মরণচাঁদের শিঙ্গাড়াও।'

শার্টের পকেটে ভিজিটিং কার্ড ঢুকিয়ে দেওয়ার ইশারা করে লোকটা বললেন, 'আসব।' তারপর লোকটা ভলভো বাসের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি এগিয়ে গেলাম কর্ণফুলী বাসের কাউন্টারের দিকে।

তার প্রায় মাস দুয়েক পর লোকটা একদিন আমার অফিসে এলেন। কাজের ভীষণ চাপ ছিল সেদিন, কিছুটা বিরক্তই হলাম। কিন্তু বাইরের গেস্টরুমে এসে তাঁকে দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল আমার। হাসতে হাসতে তার দিকে হাত বাড়ালাম আমি, তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন,

হাত মেলালেন, কিন্তু হাসলেন না।

'কেমন আছেন আপনি?'

লোকটা অগের মতোই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আছি, বেঁচে আছি।'

কিছুটা ইতস্তত করে আমি বললাম, 'কোনো সমস্যা?'

গেস্টরুমের চারপাশটায় তাকিয়ে লোকটা একটু নিচু স্বরে বললেন, 'এখানে তো অনেক মানুষ, নিরিবিলি কোনো জায়গা আগে আছে আপনার অফিসে?'

'জি, আছে।'

অফিসের ভেতরে আমাদের তিনটি বোর্ডরুম আছে। মাঝারি বোর্ডরুমটায় নিয়ে গিয়ে বসালাম তাঁকে। তারপর বললাম, 'কী খাবেন বলুন।'

'না না, কিছু খাব না।'

'কিছু তো আপনাকে খেতেই হবে। সম্ভবত আপনাকে চা এবং মরণচাঁদের শিঙ্গাড়ার নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমি।' লোকটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়ালাম।

WWW.BANGLAPDF.COM

ক্যান্টিন থেকে ফিরে এসে দেখি মাথা নিচু করে বসে আছেন লোকটা। গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন, আমি যে আবার এ রুমে ফিরে এসেছি টের পাননি তিনি সেটাও। আলতো করে আমি তার সামনের চেয়ারটাতে বসতেই মৃদু শব্দ হলো, কেমন যেন চমকে উঠলেন তিনি। তারপর সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে চোখে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমি অচেনা কেউ। বেশ কিছুক্ষণ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন সেভাবে। আমি একটু ঝুঁকে এসে তাঁকে বললাম, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে তিনি বেশ দৃঢ়তা নিয়ে বললেন, 'না না, শরীরে কোনো প্রবলেম নেই, সব ঠিক আছে।'

'তাহলে কি মন খারাপ?'

মাথা নিচু করে ফেললেন লোকটা। কোনো কথা না বলে একদম চুপ হয়ে রইলেন তিনি অনেকক্ষণ। এরই মধ্যে ক্যান্টিনবয় এসে চা-পানি-শিঙ্গাড়া দিয়ে গেল, তাকালেন না তিনি সেদিকেও। আমি চায়ের একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা উঁচু করে তাকালেন তিনি আমার

দিকে। চোখ দুটো কেমন যেন ভেজা ভেজা তার। চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে তিনি সেটাতে মুখ না দিয়ে বললেন, 'একটা উপকার করবেন আমার?'

মুচকি হাসলাম আমি। এ আর নতুন কি! আমার কাছে অধিকাংশ মানুষই আসে কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে। যশোর থেকে একজন মহিলা এসেছিলেন একদিন, জটিল একটা সমস্যা নিয়ে। তিন সন্তানের মা তিনি। এ বয়সে তিনি একটা ছেলের প্রেমে পড়েছেন, ছেলেটি তার প্রেমে পড়েছে, যে ছেলেটি কিনা অবিবাহিত এবং তার চেয়ে কমপক্ষে এগারো বছরের ছোট। সমস্যাটা মিটে গিয়েছে। মহিলা এখন সুখে আছে, সুখটা যখন খুব বেশি অনুভব করেন তখনই ফোন করেন আমাকে। সেই ছেলেটিও ফোন করে, তার সদ্য বিয়ে করা বউকে নিয়ে সুখে আছে সেও।

অফিসে এসে ইদানীং আমি প্রথম যে ফোনটা পাই সেটা রিসিভ না করেই বলে দিতে পারি কিসের ফোন এটা। হয় কাউকে সরকারি কোনো হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে, নয় তো কারো জরুরি অপারেশনে রক্ত জোগাড় করে দিতে হবে, কারো চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন তার কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, কারো মেয়ের বিয়ের শাড়ি, কারো ছেলের পরীক্ষার ফি, কত কি! সবচেয়ে ভালো লেগেছিল মোহাম্মদপুরের এক বিধবা মহিলার জমি উদ্ধার করে দিতে পেরে। তার স্বামী আড়াই কাঠার একটা জমি কিনেছিলেন। স্থানীয় এক লোক সেটা দখল করে নেয়। সাত মাস ঘুরে সে জমিটা উদ্ধার করে দিতে পেরেছিলাম আমি। মানুষের অনেক কান্না দেখেছি আমি, কিন্তু ডুকরে ডুকরে সুখের কান্না যে কী তা দেখিনি কখনো, সেদিন দেখেছিলাম। মহিলাটি আমাকে জাপটে ধরে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলেন। বন্ধুরা যদিও আমাকে প্রায়ই বলে, আমি নাকি নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই। কিন্তু ওরা জানে না, সে মোষ তাড়াতেও অনেক সুখ।

তবে আমি এসবে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পাই আমার মায়ের আর পৃথুলার। পৃথুলাকে কত দিন সময় দিয়ে আমি দেখা করতে পারিনি। ও একটুও অভিমান করেনি, রাগ তো নয়ই। কেবল মাঝে মাঝে ও আমাকে খুব নির্ভারভাবে জিজ্ঞেস করে, 'অর্ণক, তুমি ভালো আছ তো?' আমি কোনো জবাব দিতে পারি না, জবাবের আশাও করে না ও। কেবল আমার কাঁধের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে। আর অপরাধে মরে যেতে যেতে শেষ হয়ে যাই আমি। কোনো কোনো দিন হেসে হেসে ওকে বলি, 'দেখো,

বিয়ের পর আমি পুরো এক মাস তোমার হাত ধরে থাকব, একটুও কোথাও যাব না, একটু না।' কথাটা শুনে ও হাসে, কিন্তু সে হাসিতে আমার কথা বিশ্বাস করার কোনো ছোঁয়া দেখতে পাই না।

মাথাটা নিচু করে ফেলেছেন আবার লোকটা। আমি কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই বললাম, 'বলুন, কী করতে হবে?'

আগের মতোই মাথা নিচু করে রেখে তিনি বললেন, 'আগে বলুন' কথাটা রাখবেন?'

'বলুন তো আগে!'

'খুব লজ্জা পাচ্ছি বলতে।'

'লজ্জার কিছু নেই, বলুন।'

'আমার একটা মেয়ে আছে, দুটো ছেলেও আছে। দু ছেলেকে নিয়ে আমরা থাকি এখানে, মেয়েটাকে রেখেছি গ্রামের বাড়িতে।'

'আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়?'

'কিশোরগঞ্জে।' লোকটা এবার মাথা উঁচু করে বলেন, 'ওখানে আমার মা-বাবা থাকেন, তাদের সঙ্গে থাকে মেয়েটা, এবার বিএ পরীক্ষা দেবে।'

'আপনার ছেলে দুটোকে এখানে রেখেছেন, মেয়েটাকে গ্রামে রেখেছেন কেন?'

কেমন লজ্জা পেলেন লোকটা। মাথাটা নিচু করতে করতে বললেন, 'ছোট সময় মেয়েটি এখানেই ছিল, একটু বড় হওয়ার পর গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি। মেয়েরা বড় হলে তাদের জন্য আলাদা একটা ঘর দরকার হয়। এখানে আমি তাকে আলাদা একটা ঘর দেব কোথা থেকে। দু রুমের বাসার ভাড়া দিতেই বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ চলে যায়।'

'আপনি এখন মেয়েটাকে বিয়ে দিতে চাইছেন, না?'

'জি।'

'তার জন্য কিছু টাকা জোগাড় করে দিতে হবে?'

লোকটা মাথা উঁচু করে বেশ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'না।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'তাহলে?'

'ওর বিয়ের টাকাটা আমি নিজেই জোগাড় করতে চাই, তার জন্য আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি প্রায়, এ শহরে জানাশোনা লোকের সংখ্যাও কম, তাই আপনার কাছে আসা।'

'বলুন, কী করতে আমাকে?'

লোকটা এবার সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর একটু সময় নিয়ে বেশ ধীরগতিতে বললেন, 'আমি আমার একটা চোখ বিক্রি...।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি কিছুটা শব্দ করে বললাম, 'কী!'

আগের মতোই লোকটা দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আমি আমার একটা চোখ বিক্রি করতে চাই এবং এখান থেকে যে টাকা পাব সে টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।'

'মেয়ের বিয়ে দেবেন চোখ বিক্রি করে!'

'এ ছাড়া কোনো উপায় নেই আমার।'

'কত টাকা লাগবে আপনার?'

'বিয়েতে তো অনেক টাকা খরচ হয়।'

'আমি যদি আপনাকে কিছু টাকা জোগাড় করে দিই।'

'না।' লোকটা এত শব্দ করে 'না' বললেন, আমাদের রুমের পাশ দিয়ে আমার এক সহকর্মী যাচ্ছিলেন, তিনি কাচের দরজাটা খুলে উঁকি দিলেন একবার আমাদের দিকে চেয়ে। তারপর মুহূর্তেই তৈরি করা আমার হাসিমুখ দেখে কোনো বাক্য ব্যয় না করে চলে গেলেন দরজাটা আবার ঠেলে দিয়ে।

সহকর্মীটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে-মুখে আবার অবাকচিহ্ন ফুটে উঠল আমার। লোকটার একটু এগিয়ে বসে বললাম, 'কেন?'

খুব আস্তে আস্তে তিনিটি বললেন, 'স্রষ্টাই যেহেতু আমাকে তেমন করুণা করেনি, মানুষের করুণা নিতে ইচ্ছে করে না তাই।'

'আপনি কি আরও একটু ভেবে দেখবেন?'

'মেয়েটার বয়স হয়ে যাচ্ছে সে জন্য না, অন্য একটা কারণে ওকে একটু তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার। মেয়েটার বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'তবু আপনি আরও একটু ভেবে দেখুন। তারপর নাহয় কিছু একটা করা যাবে।'

'যা-ই ভাবি না কেন, বিয়েটা যত দ্রুত সম্ভব দেওয়া দরকার। মেয়েটার চিন্তায় রাতে ইদানীং ঘুমও হয় না, অফিসেও কাজ-কর্মে ভুলভাল

করে ফেলছি, এ নিয়ে লজ্জাও পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আপনি সাতটা দিন ভাবুন। তারপর আমার কাছে আসুন। এর মধ্যে কোনো কিছু না হলে আমি আপনার চোখ বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

আমার হাত দুটো হঠাৎ চেপে ধরলেন লোকটা, তারপর ছলছল চোখে বললেন, 'আমি আপনার প্রতি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

চা ঠান্ডা হয়ে গেছে, শিঙ্গাড়া দুটোও পড়ে আছে প্লেটে, কোনো কিছু না ছুঁয়েই চলে গেলেন লোকটা। লিফটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সেই যে নিজের টেবিলে এসে বসলাম, একটুও কাজ করতে পারিনি সেদিন।

পুরো সাত দিন একরকম উৎকণ্ঠাতেই ছিলাম। সারা জীবন স্রষ্টাকে যতটা না ডেকেছি তার চেয়ে বেশি ডেকেছি এ কয়দিন। সাত দিন শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল আট দিন, নয় দিন, ঊনত্রিশ দিন, এক মাস; না, লোকটা এলেন না। এরই মাঝে টিকে ভবনে একবার খোঁজও নিলাম। টিকে ভবনে তার অফিস কিন্তু কোন অফিসে কাজ করেন তিনি তা তো জানি না, জানা হয়নি তা। দেখা না পেয়েই তাই ফিরে আসতে হয়েছিল সেদিন। তার পর থেকে লোকটার অপেক্ষা করতাম প্রায় প্রতিদিনই, প্রতিদিনই ভাবতাম আজ অফিসে গিয়েই লোকটার দেখা পাব, অফিসে ঢুকেই দেখতে পাব লোকটা বসে আছে বাইরের গেস্টরুমে। অপেক্ষা আর ভাবনা একসময় ফিকে হয়ে আসে, ভুলে যাই তার কথা।

দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার দেড় বছর পর আজ অফিসে ঢুকেই লোকটাকে দেখতে পাই আমি। গেস্টরুমে বসে আছেন তিনি, মাথা কিছুটা নিচু করে। তাকে দেখে চমকে না উঠলেও অবাক হয়ে একটু থমকেই দাঁড়ালাম। কালো চশমা চোখে, তবু তাকে চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি আমার, প্রায় আগের মতোই আছেন তিনি, কেবল কপালের বাঁ পাশে এবং বাঁ গালে মোটা কালো দাগ ছাড়া।

ভীষণ কাজ আছে আজ অফিসে। তাই একটু সকাল সকালই এসেছি। পিয়ন ছাড়া সম্ভবত অফিসে এখনো কেউ আসেনি, গেস্টরুমেও কেউ নেই। নিঃশব্দে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা স্পষ্ট স্বরেই বললাম, 'আপনি!'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন,

'অর্ণক?'

তার ডান হাতটায় আমার ডান হাতটা রেখে আমি বললাম, 'এত দিন কোথায় ছিলেন আপনি? কেমন আছেন? ভালো আছেন তো?'

মৃদু হাসলেন লোকটা, 'অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলেছেন আপনি, বসে বলি।'

হাতটা ছেড়ে দিলাম আমি, 'শিওর।'

লোকটা বসতে বসতে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আরো আগে দেখা করা উচিত ছিল আমার। দেখা করতে না পেরে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত।'

'না না ঠিক আছে।' লোকটার দিকে আমি ভালো করে তাকালাম। ঘন কালো একটা চশমা পরে আছেন তিনি। বাঁ পাশের কপাল এবং গালের কালো দাগটা কেমন যেন এবড়োখেবড়ো ফুলে আছে। কিছুটা ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে সেটা।

'আপনার কাছে আজ অন্য একটা কাজ নিয়ে এসেছি।'

WWW.BANGLAPDF.COM
HEAVEN OF BANGLA EBOOKS

100%Free Ebooks Download !!! Please Visit
Our Site To Get Your Favorite Ebooks Now